মানস প্রিয়া

শক্তিপদ রাজগুরু

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩
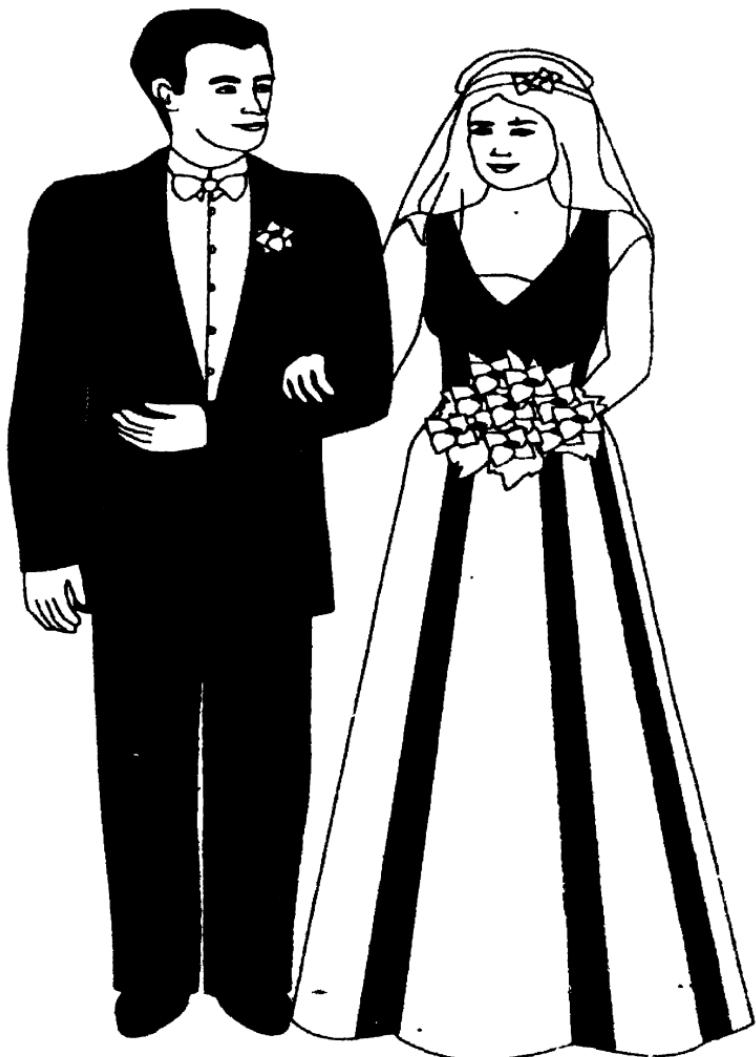
মানস প্রিয়া
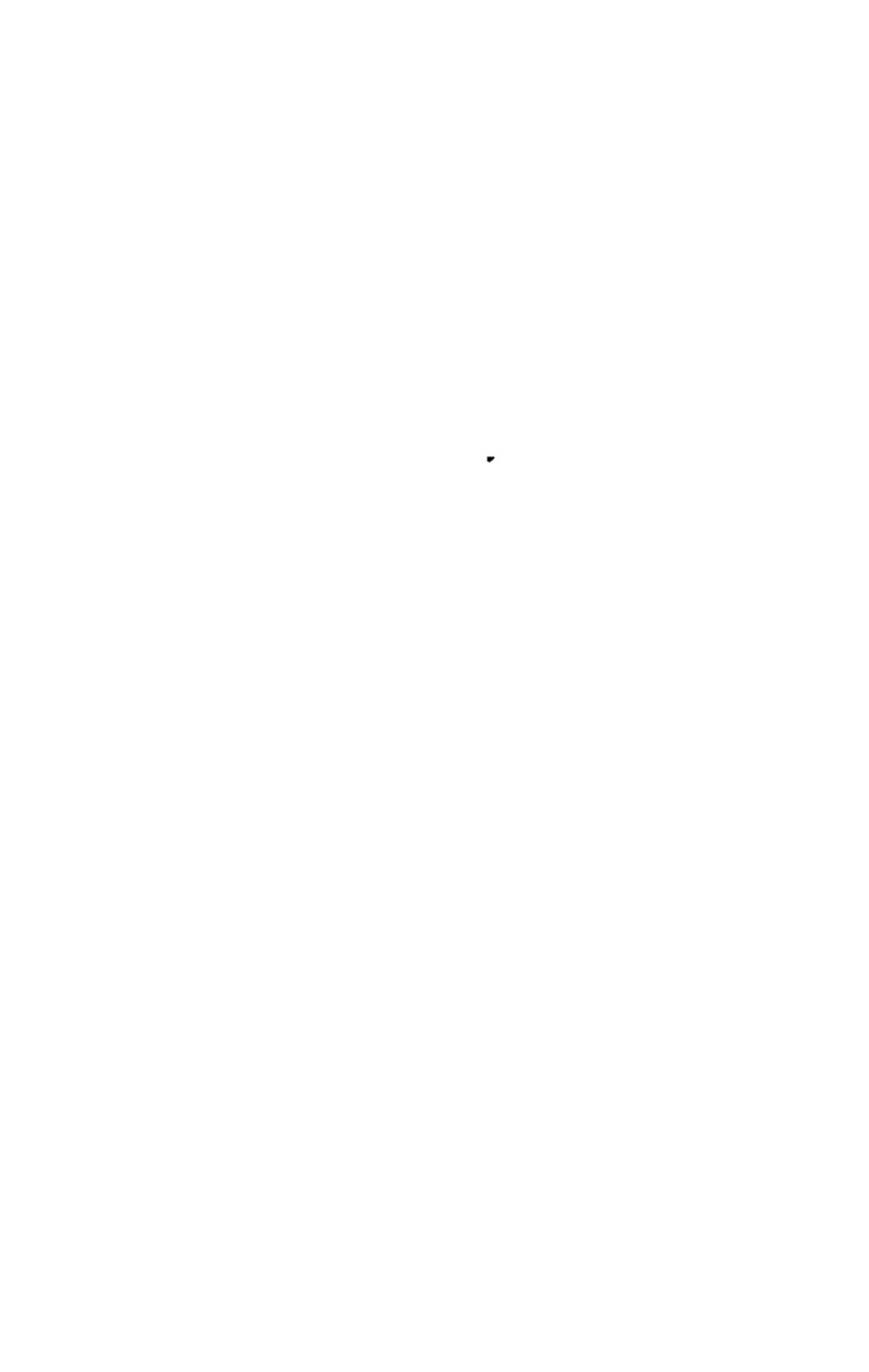
বিজয় গ্রাম থেকে প্রথম কলকাতায় এসেছে তার ভাগ্য অন্বেষণে। গ্রামে এককালে তার বাবা ছিলেন জমিদার, বিরাট বাড়ি। জমিদারীর আয়ও কম ছিল না তাদের। বিজয়ের বাবা নরনারায়ণ বাবু জানতেন জমিদারী এই বিষয় আশয় একদিন চলে যাবে। তাই তার সহপাঠী বন্ধু নন্দকিশোর বাবুর সঙ্গে কলকাতায় নন্দকিশোর বাবুর ব্যবসার পার্টনার হয়ে বেশ কিছু টাকা দিয়ে কাগজপত্র করিয়ে একটা কারখানা করেন। নন্দকিশোরও তার বন্ধু নরনারায়ণ বাবুর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিলেন। দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। নন্দকিশোরবাবু নরনারায়ণকে বছরে ভালো টাকাও দিতেন ব্যবসার লভ্যাংশ হিসাবে।

হঠাৎ নরনারায়ণবাবু মারা গেলেন। তার কিছুদিন পর নন্দকিশোরবাবুও গত হলেন। মৃত্যুকালে নরনারায়ণবাবু সব কিছু বিজয়কে জানিয়ে যেতে পারেননি। পুরোনো নায়েবও এই কলকাতার ব্যবসার খবর সঠিক জানতো না। জমিদারীও চলে গেছে। নায়েবও নেই। বাবা মারা যাবার পর বিজয় বুঝতে পারে যে ঠাটবাট বজায় রাখার জন্য বাবা অনেক টাকা ঋণ করেছিলেন। জ্ঞাতি কাকাও তৈরী ছিল। সেও এবার নানা ভাবে বিজয়ের জমি ঘর বাড়িও দখল করে নেয়। বিজয় সামান্য কিছু হাতে পায় বাবার দেনা মিটিয়ে। কলেজ থেকে সবে বি.এ. পাশ করেছে বিজয়। মা-বাবা বেঁচে নেই। একা সে বের হয়ে পড়ে নিরুদ্দিষ্ট পথে। যদি কলকাতায় কোন পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে যায়। তাহলে বাঁচার জন্য কোন ধান্দা হয়ে যাবে।

হাতে ব্যাগটা নিয়ে চলেছে কলকাতার পথে। দুপুর নেমেছে। কলকাতার এদিকের পথঘাট কিছুটা নির্জন। ওদের গ্রামের একজন কলকাতার একটা মেসে থাকে শ্যামবাজারের দিকে। ঠিকানাটা নিয়ে বিজয় চলেছে সেই ঠিকানার সন্ধানে। যদি আশ্রয় মেলে।

দুটো লোকও তার উপর নজর রেখেছিল। হাতের ব্যাগটা দামী। বিজয়ের চেহারাটাও ভদ্রগোছের। তারা ধরে নেয় ওর কাছে মালকড়িও কিছু আছে। ছনু আর কালু সামান্য কাজ করে। আর বাড়তি সময়ে তারা দুজনে টানা মালের কারবারও করে। একজন রোগা সিটকে লম্বা, অন্যজন বেশ গোলগাল বেটে চেহারার। সিটকে ছনু এবার তাক বুঝে ব্যাগটা ছোঁ মেরে নেয় বিজয়ের হাত থেকে। বিজয় বুঝতে পারে লোকটা তার সর্ব্বস্ব টাকাকড়ি-কলেজের কাগজপত্র জামাকাপড় শেষ সম্বল নিয়ে পালাতে চায়। বিজয়ও বলিষ্ঠ তরুণ। সেও তাড়া করে ওদের। ছনুকে ধরে ফেলে বিজয়। ছনু তখন কালুকে ব্যাগটা চালান করেছে। কালু পালাতে চেষ্টা করছে। বিজয় তাকেও ধরে ফেলে। দুজনকে ধরে মারতে থাকে। কালু ছনু দুজন প্রাণপণে লড়তে থাকে বিজয়ের সাথে। আশেপাশে লোকজন জমা হলেও কেউ এগিয়ে আসে না বিজয়কে সাহায্য করতে। তবু সে একাই লড়তে থাকে। কালু এবার একটা ছোরা বের করে, বিজয় চমকে ওঠে। তবু সে আক্রমণ করে কালুকে। হঠাৎ কালু ছনু দেখে একটা গাড়ি এসে থেমেছে — আর গাড়ি থেকে নামছে একজন বলিষ্ঠদেহী বয়স্ক ভদ্রলোক। ওকে দেখেই কালু ছনুও চমকে ওঠে। তারা হাতের শিকার ফেলে দৌড়ালো পাশের গলি দিয়ে। ভয়েই পালিয়ে যায়। বিজয়ও হাতে ছুরির আঘাত পেয়েছে। জামাটা রক্তে ভিজে গেছে। তবু ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে। যুদ্ধ করে সেটাকে বাঁচিয়েছে।

এবার সেই ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। একটা পা একটু খুঁড়িয়ে চলেন তবে সেই অক্ষমতা তাকে কাবু করতে পারেনি। ভদ্রলোক বলেন, — সাবাস্ ইয়ং ম্যান। আজ দেশের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানেনা। তুমি একাই ওই ডাকাতদের সঙ্গে লড়েছো। একি! হাতটা যে ওদের ছোরাতে কেটে গেছে। বিজয়ও দেখে জামাটায় রক্তের দাগ। হাতে ওদের ছুরিটাও লেগেছে। বিজয় বলে—ও কিছুনা।

ভদ্রলোক বলেন, — না না, এখুনি একটা ইঞ্জেকসন নিয়ে নেবে। কোথায় যাবে? চল তোমাকে ছেড়ে দেব, না হলে ওরা আবার কিছু করতে পারে।

বিজয় বলে,

— এদিকে আমার এক চেনা ভদ্রলোক মেসে থাকে, কলকাতায় নতুন এসেছি। ওর ওখানেই যাবো। ঠিকানাটা ...

বুক পকেটে হাত দিয়ে চমকে ওঠে বিজয়। ওখানেই তার গ্রামের সেই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা ছিল। কিন্তু মারপিট করার সময় পকেটটা ছিঁড়ে গিয়ে সেই কাগজটাও কোথায় হারিয়ে গেছে। এবার সত্যিই বিপদে পড়ে বিজয়। তার শেষ অবলম্বন ঠিকানাটাও হারিয়ে গেছে। এই মহানগরীতে সে আজ নিরাশ্রয়। এতসব শুনে ভদ্রলোক বলেন,

—তাহলে যাবে কোথায়?

—জানিনা। গ্রাম আমার উত্তরবঙ্গের চা বাগান অঞ্চলে। সেখানে ফেরার পথও নেই। কলকাতায় এসেছিলাম। এখন পথেই পড়ে থাকতে হবে।

ভদ্রলোক কি ভেবে বলেন,

— ওঠো আমার গাড়িতে।

অবাক হয় বিজয়।

— মানে।

ভদ্রলোক বলেন,

— মানে একটা কিছু আছে নিশ্চয়! পরে জানবে, এখন ওঠো তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। তোমারও হয়তো আমাকে দরকার হবে।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভদ্রলোক।

গাড়িটা এসে ঢুকেছে সুন্দর পাচিল ঘেরা একটা বাংলোর মধ্যে। কলকাতা শহর হলেও এদিকটা এখনও ফাঁকা রয়েছে। ওপাশে একটা পার্ক খেলার মাঠ। বেশ কিছু বড় গাছ গাছালিও রয়েছে। সবুজের দেখা মেলে। আর বাংলোর মধ্যেও বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে — বাগান গাছগাছালিও রয়েছে। বিজয় ভদ্রলোকের সঙ্গে বাংলোতে ঢোকে। দেখে বসার ঘরের দেওয়ালে ভদ্রলোকের মিলিটারী পোষাকে তোলা অনেক ছবি, মেডেল। কারগিল-এর পাহাড়ে মিলিটারীদের মাঝে তিনি। এবার ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানতে পারে বিজয়। ইনি কর্নেল সমরজিৎ রায়। কারগিল যুদ্ধের অন্যতম বিজয়ী অধিনায়ক। যুদ্ধের সময় গুলিতে তার একটা পা জখমও হয়। মিলিটারী থেকে রিজাইন করে এখন এখানেই বাস করেছেন। কর্নেল বলেন,

— আমি জীবনভোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি। কারগিলে জয়ী হয়েছি। কিন্তু আমার লড়াই এখনও থামেনি। তাই যে লড়াই করতে পারে তাকে আমি আপনজন বলেই মনে করি। তোমাকে তাই জেনেছি। সামনে তোমার লড়াইয়ের জীবন— লড়তে হবে আদর্শের সাথে। যেমন আমি লড়ছি।

বিজয় বলে, — এখনও লড়ছেন?

— ইয়েস। লড়তে হবে, যতদিন পর্যন্ত না এ-লড়াইতে জয়ী হই। সেই দিনগুলোর কথা আমি এখনও ভুলিনি।

কর্নেলের চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীত দিনের কথা।

সব কিছু ঘটনার মূলে কিছু ঘটনা থাকে — যেগুলো ঘটে যায় নিজের থেকেই — সহজভাবে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলোও তেমন বিচিত্র মাত্র। এতদিন সে এই ভাবনাগুলো নিয়ে কোন ভাবনা-চিন্তা করেনি। করার সময়ও ছিল না। সে ওই ঘটনার স্রোতে চলছিল খড়কুটোর মত। তার করার কিছুই ছিল না। এখন কলকাতায় এসে পড়ে এই ভাবে একজনের আশ্রয়ে এসে বিজয় যেন পায়ের তলে মাটি পায়। এবার তাকে সামনের দিকে চাইতে হবে। চলার পথে এগিয়ে যেতে হবে।

অতীতের ঘটনাগুলো তার মনে ভেসে ওঠে। সেই ভাবনার ডানায় ভর দিয়ে তার মন ফিরে যায় ফেলে আসা সেই ছায়া নিবিড় গ্রামের দিকে। বিজয়ের বাবা নরনারায়ণবাবু ছিলেন কুসুমপুর গ্রামের জমিদার। ওই এলাকার নামীদামী মানুষ।

কুসুমপুর ছিল সভ্যজগত থেকে দূরে একটি গ্রাম। গাঁয়ে যাতায়াতের পথ বলতে ছিল মাটির একটা সড়ক। বড় রাস্তা থেকে পথটা একেবারে মাঠের মধ্যে দিয়ে কাদঁরের ধার দিয়ে গিয়ে দু'একটা ছোটগ্রাম পার হয়ে কুসুমপুরে পৌছেঁছিল। আশ-পাশের গ্রামের তুলনায় কুসুমপুর ছিল সমৃদ্ধ গ্রাম। অবশ্য তার মূলে ঐ নরনারায়ণবাবুদের জমিদারীর ঐশ্বর্য। গ্রামের মধ্যে ওদের তিনমহলা প্রাসাদ। বাইরের মহলে ছিল কাছারি বাড়ি — সেখানে সেরেস্তা বসতো। ওদিকে ছিল জমিদারের খাসকামরা — এদিকে নায়েব গোমস্তাদের ঘর ছিল — পাইক বরকন্দাজরাও থাকতো। সারা দিনে এখানে কর্ম ব্যস্ততা ছিল। প্রজা পাচকরা আসতো বিভিন্ন মহল থেকে। কাছারি

সরগরম হয়ে থাকতো তাদের ভিড়ে। পাইকরাও গেটে টুলে বসে থাকতো। প্রজাদের যেন ওইখান থেকেই নীরব শাসানি দিত তারা।

দর্পনারায়ণবাবু ছিল নরনারায়ণবাবুর বাবা। সেই দর্পনারায়ণবাবুর চেষ্টাতেই গ্রামে হাইস্কুল হয়। গড়ে ওঠে দাতব্য চিকিৎসালয়। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য দর্পনারায়ণ অনেক কিছুই করেন। তার ছেলে নরনারায়ণ। দর্পনারায়ণ মারা যাবার পর নরনারায়ণই হাল ধরেন ওই বিশাল জমিদারীর। দর্পনারায়ণ কলেজের পথে যাননি। কিন্তু তিনি নরনারায়ণকে কলেজে পড়িয়েছিলেন। তিনি জানতেন ইংরেজ আমলে সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে জমিদারীও রাখা যাবে না। তাই তিনি নরনারায়ণকে কলেজে পড়িয়েছিলেন হোস্টেলে রেখে। নরনারায়ণ তাই ইংরেজী জানতেন ইতিহাসও জানতেন। বাবা মারা যাবার পর নরনারায়ণ-এর হাতে জমিদারী আসার পর থেকে নরনারায়ণও কথাটা ভেবেছে।

নরনারায়ণ-এর সঙ্গে কলেজে পড়তো নন্দকিশোর। ও একটা ভিতরের গ্রামের ছেলে। নন্দকিশোরের বাবা ছিলেন দর্পনারায়ণের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নন্দকিশোরও এখানেই পড়েছে — তাই নরনারায়ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নন্দকিশোরও পড়াশোনাতে ভালো নরনারায়ণের সঙ্গেই পাশ করে কলেজ থেকে।

নন্দকিশোর বলে,

— জমিদারীর আয় থেকে রাজ্যপাঠ বেশীদিন চালানো যাবে না নরনারায়ণ। দিন বদলাচ্ছে। ইংরেজ তার নিজের আয় রাজস্ব বাড়াবার জন্য জমিদারী প্রথার পত্তন করেছিল। কিন্তু ইংরেজকেও একদিন চলে যেতে হবে। ইংরেজকে তাড়াবার জন্য দেশের মধ্যে তখন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পাশে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনও শুরু হয়েছে।

দেশের মধ্যে তখন তরুণ একটা শক্তি গোপনে মাথা তুলেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনও হয়েছে। মেদিনীপুরে - কলকাতায় - ঢাকাতেও শুরু হয়েছে বিপ্লবীদের আন্দোলন। নন্দকিশোরও মনে প্রাণে সেই আন্দোলন সমর্থন করে।

নরনারায়ণকে জমিদারী চালাতে হয় — প্রাকাশ্যে সে এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে না পারলেও গোপনে সে এই আন্দোলনের সমর্থক, তাদের অর্থ সাহায্যও করে গোপনে। আর নরনারায়ণ বিশ্বাস করে যে ইংরেজকে

একদিন এদেশ ছেড়ে যেতেই হবে। আর তারপর দেশের মানুষ শাসনভার পেলে জমিদারীর মত এই শোষণমূলক প্রথাকে বিদায়ই করে দেবে। জমিদারদের দিন শেষ হয়ে যাবে। তাই নরনারায়ণও ভাবছে কথাটা।

তখন বাঁচার জন্য একটা কিছু করতে হবে। নন্দকিশোর চাকরী নেয়নি। সে এবার কোন একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ছে। তার ইচ্ছা নিজে একটা কারখানা গড়ে তুলবে। বিদেশ থেকে অনেক মালই আনা হয়। দেশে সেইসব মাল তৈরী হলে কমদামে বিক্রী করেও প্রচুর লাভ থাকবে। নন্দকিশোরও মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। এর মধ্যে নরনারায়ণের চেষ্টাতে এখন গ্রাম অবধি পাকা রাস্তাও হয়েছে। আর ষ্টেশন থেকে বাসও চলতে শুরু হয়েছে। ফলে গ্রামের চেহারাও বদলেছে। নরনারায়ণও কলকাতায় আসে মাঝেমাঝে। নন্দকিশোর ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এখন কলকাতার উপকণ্ঠে একটা পতিত জমি কিনে সেখানে ছোট শেডও বানিয়েছে — আর ছোটখাটো মেশিন বসিয়ে মালপত্র তৈরী করে আর ওই জমির একদিকে একটা ছোট ঘর বানিয়ে সেখানে থাকে।

নরনারায়ণও বন্ধুর কাছে আসে। কলকাতায় তাকে মাসে মাসে আসতে হয় বিষয় আশয়ের ব্যাপারে। হাইকোর্টে মামলাও থাকে। ইদানীং দর্পনারায়ণের ছোটভাইয়ের এস্টেট থেকেও তাদের বিষয় সম্পত্তির দখলদারি নিয়ে মামলাও শুরু হয়েছে, আর সেই মামলা কলকাতার হাইকোর্ট অবধি গড়িয়েছে। ওর কাকা কর্দপনারায়ণও জেদী লোক তার ছেলেও বাবার মত লোভী আর কৌশলী।

ওদের তুলনায় নরনারায়ণ উদার প্রকৃতির মানুষ। তাই তারাও নানাভাবে নরনারায়ণকে বিপদে ফেলতে চায়, বিব্রত করতে চায়। তাই মামলাও শুরু করেছে।

নরনারায়ণও বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিপদে পড়েছে। জমিদারীর উপর তার ঘৃণা জন্মেছে। তবু মামলা চালাতে হয়। কলকাতায় এসে সেদিন নরনারায়ণ এসেছে নন্দকিশোরের কারখানায়।

নন্দকিশোর ছোটখাটো কারখানা নিয়ে ভালোই আছে। লাভও করেছে তার কারখানা। মালের চাহিদাও প্রচুর কিন্তু কারখানা বাড়াবার মত মূলধন তার নেই তাই বড় করাও যাচ্ছে না। নরনারায়ণ সব দেখে শুনে বলে,

— নন্দ আমি যদি তোকে টাকা দিই কারখানা বাড়াতে তাহলে পারবি?

নন্দকিশোরও স্বপ্ন দেখে তার কারখানা বিশাল বড় হবে আরও অনেক ধরনের মাল বানাতে পারবে। লাখলাখ টাকার কারবার করতে পারবে সে, নন্দ বলে

— নিশ্চয়ই। টাকা পেলে এই কারখানার চেহারা এবং টাকার অঙ্কও বাড়বে বহুগুন।

নন্দকিশোর সৎ পরিশ্রমী। তার উপর বিশ্বাস করতে পারবে নরনারায়ণ। তিনি বলেন,

— তাহলে কত টাকা লাগবে বল — তোর প্ল্যান প্রোগ্রাম বাজেট নিয়ে কথা হবে, একদিন বাড়িতে আয়। টাকা আমি দেব। নন্দ বলে,

— তুই টাকা দিবি। তাহলে তুইও পার্টনার হয়ে যা এই নতুন কারখানার। নতুন করে কারখানা গড়বো। পাশের এই পুকুর বাগান জলা জায়গাও বিঘে দশেক হবে। এইটাই কিনে নেব, দরও বেশী হবে না এখন। এইখানেই তৈরী হবে কারখানা এবং কোয়াটার।

নন্দকিশোরও প্ল্যান প্রোগ্রাম করে নিয়ে আসে গ্রামে নরনারায়ণ-এর কাছে। নরনারায়ণও বুঝেছে দেশ স্বাধীন হলে, দেশী মালের চাহিদা বাড়বে। কলকারখানার চাহিদা বাড়বে। আর জমিদার সেজে পরের মুনাফার অংশ ভোগ করে দিন চলবে না।

তখন তার একমাত্র সন্তান বিজয় এসেছে। তার ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে। তাই এই কারখানা গড়বে সে। নন্দকিশোরকে টাকাও দেয়। নন্দকিশোর আর নরনারায়ণের যৌথ উদ্যোগে এবার ওই জায়গায় গড়ে ওঠে নতুন কারখানা। তাদের প্রডাকসনও শুরু হয়। এমনদিনে দেশও স্বাধীন হলো — দাঙ্গা - মন্বন্তর - যুদ্ধ - নানা দুর্যোগের অবসান ঘটিয়ে।

বিজয় তখন ছোট। নরনারায়ণ দেখেন এতদিনের গড়ে ওঠা রাজ্যপাঠ রাতারাতি এক কলমের খোঁচাতেই ঘুচিয়ে দিল দেশের নতুন সরকার। বিজয় তখন স্কুলে পড়ছে। দেখেছে সমাজের বুকে নেমে আসা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটাকে। এতদিন ধরে জমিদার শ্রেণীই ছিল গ্রামীণ সমাজের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তিত্ব। তারা কেউ কেউ অবশ্য লোভী অত্যাচারী লম্পটও ছিল। প্রজাদের উপর অত্যাচারও করত কিন্তু তারা সংখ্যায় নগন্য। বেশীর ভাগ

জমিদার ছিলেন সজ্জন-প্রজাবৎসল এবং হৃদয়বান ব্যক্তি। তারাই গ্রামীন সমাজের বুকে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রদীপ জ্বেলে রাখতেন। তখন ইংরেজ সরকার সাধারণ মানুষের জন্য ভাবতো না।

গ্রামে স্কুল-হাসপাতাল-পথঘাট-পানীয় জলের জন্য দিঘী-কুয়ো এসব করতেন জমিদাররাই। কেউ অন্যায় করলে তাকে দণ্ডও দিতেন। সামাজিক জীবনে তাদের ভূমিকা ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেই সমাজ ব্যবস্থাই বদলে গেল রাতারাতি। আর সামাজিক জীবনে নেমে এল একটা শূন্যতা।

নরনারায়ণও দেখেন সেই নায়েব - গোমস্তা - পাইকের দলকেও বিদায় দিতে হল। তাদের আর কোন কাজই নেই। প্রজারাও আর জমিদারের কাছারিতে আসে না। তাদের সঙ্গে জমিদারের কোন সম্পর্কও আর নেই। আসার প্রয়োজনও নেই। কাছারি শূন্য হয়ে গেল। অবশ্য নায়েব গুপীনাথ মিত্তির হিসাবী লোক। ওর বাবাও এদের নায়েব ছিলেন দর্পনারায়ণের আমলে। তার সুপুত্র গুপীনাথও কোনমতে টুকে ফুকে ক্লাশ টেন অবধি উঠে বারকয়েক ম্যাট্রিকে ডিগবাজী খেয়ে পোক্ত হয়ে বাবার সঙ্গে কাছারিতে বসতে শুরু করে।

গুপীনাথও বুঝেছিল জমিদারী চলে যাবে। তাই সেও নরনারায়ণের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে অনেক জমি-বাগান-নামে বেনামে বন্দোবস্ত করে ভালো টাকা লুটেছে। অবশ্য তার কিঞ্চিৎ দিয়েছে নরনারায়ণকে আর বেশীটা লুটেছে গুপীনাথই। বেশ কিছু কাগজে নরনারায়ণের সই করিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে।

তারপর জমিদারী চলে যাবার পর চলে যাবার পর নিজে হাটতলায় একটা বিশাল বাড়ি হাকিয়েঁছে আর শোনা যায় গ্রামের বাইরে পতিত ডাঙাটাকেও সে নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে সেখানে ব্যাঙ্কের টাকায় ধানকল বানাবে।

বাজারে তার ছেলে তখন বিরাট সার লোহা সিমেন্টের দোকানও করেছে। আর গুপীনাথবাবুই এবার পঞ্চায়েতে দাড়াঁবে। এতকাল নরনারায়ণবাবুই ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। তার কাছারির একদিকে একটা বাড়িতে ছিল পঞ্চায়েতের অফিস। গুপীনাথ অবসর সময়ে সেই পঞ্চায়েতের কাজ দেখাশোনা করত। এখন গুপীনাথও আর জমিদারের বেতনভোগী কর্মচারী

নয়। সেও এবার বিড়াল থেকে বনবিড়ালে পরিণত হয়েছে তার স্বপ্ন এবার ক্রমশঃ সে এই এলাকার বাঘেই পরিণত হবে। অবশ্য তার জন্য জমিও তৈরী করেছে গুপীনাথ। সে দেখেছে এতকাল জমিদাররাই ছিল সবকিছুর উপরে। তাদের ছিল প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি।

এখন জমিদারী চলে যাবার পর তাদের অনেকেরই অবস্থা কাহিল। নরনারায়ণ তবু কলকাতায় কারখানা করে এখন অবস্থা কিছুটা বজায় রেখেছেন। তার বাড়িতেও দোল দুর্গোৎসব তেমনি ঘটা করেই হয়। কিন্তু কর্দপনারায়ণের বংশধরদের অবস্থা কাহিল। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে এসেছে। তবু এখনও তাদের তরফের ঠাটবাট বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে। ফলে তাদেরও টাকার দরকার।

গুপীনাথ এখন গ্রামের মধ্যে ধনী ব্যক্তি। সেই ছোট শরীকদের টাকা দেয়। অবশ্য তার জন্য দলিলপত্রও করিয়ে নেয় ভালোভাবেই। ক্রমশঃ গুপীনাথই এবার নায়েব থেকে নতুন সমাজের সর্বময় কর্তা হতে চায়। তাই বুঝেছে এখন সমাজের মাথায় বসতে গেলে দখল করতে হবে। এখন গ্রাম সমাজে নতুন জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠবে। আর তারা আসবে ওই নতুন গজিয়ে ওঠা বণিক শ্রেণী আর ব্যাঙের ছাতার মত গজানো রাজনীতির ছত্রছায়ায় পালিত নেতা নামক জীব থেকে। যারা অন্যকে লুঠ করে সমাজে মাথা তুলবে।

বিজয় মাধ্যমিক দিয়েছে। সেও দেখছে তাদের শ্রেণীর অবলুপ্তি। ক্রমশঃ তারা হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিশাল বাড়িটার একদিকে কাছারি, কত লোকজন আসতো। দিনভোর সেখানে কাজকর্ম চলতো। এখন সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমেছে। সেই কাছারি বাড়িটা এখন নীরব। স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঠাকুর বাড়িতেও নিয়মরক্ষা করে পূজা হয় মাত্র ভক্তের সমাগম আর নেই। বড় বাড়িটা ঠিকমত মেরামতও করা হয় না। ওদিকে ছোট তরফের মহলের কিছুটা ভেঙে পড়েছে। সেই অংশ মেরামত করার অবস্থাও আর নেই।

শোনা যায় গুপীনাথবাবু নাকি এখন ছোট শরীকের মহল কিনে নিতে চায়। গুপীনাথ জিপ নিয়ে ঘুরছে এলাকাতে। ভোটের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে গড়ে উঠেছে তার ধানকল। প্রান্তরের মাঝে বিরাট মিল তৈরীর কাজ

প্রায় শেষ। এগ্রাম-আশপাশের গ্রামের বহু বেকার ছেলে এখন তার দলে কাজ করেছে। গুপীনাথ নাকি সকলকে কাজের ব্যবস্থাও করে দেবে। তাই মাছিরা যেমন চিটে গুড়ের হাড়ির পাশে ভ্যানভ্যান করে— ওরাও তেমনি ঘিরে রেখেছে তাদের প্রিয় নেতা সমাজ সেবক গুপীনাথকে। ইদানীং গুপীনাথের নামের পাশে এমন অনেক বিশেষণও যুক্ত করেছে তারা।

নরনারায়ণবাবুও দেখেছেন সমাজের বুকে গড়ে ওঠা এই নতুন গজিয়ে ওঠা শ্রেণীকে। কয়েকবছরের মধ্যে গ্রামজীবনের সেই পুরোনো সমাজ ব্যবস্থাটা পালটে গেছে। সেখানে পুরোনো শ্রেণীর কোন ঠাঁই নেই। কারণ গুনীজনরাই এর মধ্যে জমিদারদের লুণ্ঠনকারী শোষক ইত্যাদি বদনাম দিয়ে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে।

নরনারায়ণবাবুর শরীর ভেঙে পড়েছে। এবার আর পঞ্চায়েতে দাঁড়াননি তিনি। কলকাতায় অবশ্য যান মাঝে মাঝে। এখন নন্দকিশোরও কারখানা অনেক বড় করেছে। দুই বন্ধুর মধ্যে সদ্ভাবও বেড়েছে। নরনারায়ণ দেখছে নন্দের মেয়েকেও। সুন্দর ছোট মেয়েটাকে দেখতে যেন ফুলের মতই। নন্দকিশোর বলে,

— তোর ছেলে কলেজের পড়া শেষ করলে কলকাতায় পাঠিয়ে দে। এখানে এসে এবার সেও কারখানার কাজকর্ম দেখাশোনা করুক। ওদেরই সব বুঝে নিতে হবে। আমাদের তো দিন ফুরিয়ে আসছে। তারপর আমাদের পরিবেশে গড়া কারখানাকে দেখভাল করুক ওরাই।

নরনারায়ণ অবশ্য বাড়িতে এই কারখানা গড়ার কথাটা এখনও জানায়নি। তার স্ত্রীও মারা গেছে কিছুদিন আগে। এখন সংসারে নরনারায়ণবাবু একা বিজয় থাকে শহরের হোস্টেলে। সেও বাবার বিষয়-আশয় কারখানার খবর তেমন রাখে না। আর নন্দকিশোর এখানে কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। সেও নরনারায়ণের গ্রামে বহুদিন যায়নি। তবে গ্রামের পরিবর্তনের খবরটাও নরনারায়ণের মুখেই পান। তাই বলে,

— গ্রামে আর থাকতে পারবি না নরনারায়ণ। তোর জন্য কলকাতায় একটা বাড়ি করি। এখানে চলে আয়।

নরনারায়ণ তবু দেশের মায়া কাটাতে পারেন না। এখনও বিষয়-আশয় কিছু রয়েছে। দেশসেবাও রয়েছে। তাছাড়া গ্রামেই মানুষ শেষ জীবনে গ্রাম

ছেড়ে এই অজানা শহরে এসে থাকতেও মন চায় না তার। তাই বলেন,
— বেশ তো আছিরে গ্রামে।

নন্দ বলে,

— তুই আসবি না বুঝেছি তবে বিজয়ের ভবিষ্যত বলে কথা, তাকে গ্রামে আটকে রাখবো না।

নরনারায়ণও ভাবছে কথাটা, বিজয় সেবার কলেজের ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে এসেছে। বাবারও শরীর ভালো যাচ্ছে না। ওদিকে গুপীনাথও তখন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হয়েছে, এখন ওর ধানকলও চলছে। একটা জিপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন গুপীনাথ লোকজন নিয়ে এসেছে। বিজয় দেখে তাদের বাড়ির ওদিকে বাগান মায় কাছারি বাড়ির জমিটাও গুপীনাথ আমীন লোকজন এনে মাপজোক করছে। সঙ্গে রয়েছে ছোট তরফের বর্তমান বংশধর কেশববাবুও। নরনারায়ণের কদিন শরীর খারাপ। প্রেসার-সুগারও বেড়েছে সঙ্গে আরও নানা উপসর্গও রয়েছে। ডাক্তারও বলেছে সাবধানে থাকতে হবে।

বিজয়ই গুপীনাথকে বাধা দেয়।

— এসব আমাদের জায়গা। আপনি এখানে কি করেছেন?

গুপীনাথ বলে,

— ছোটবাবু, এসব জায়গা তো নরনারায়ণবাবু আমাকে আগেই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। তার জন্য কাগজপত্রও রয়েছে। এখন ভাবছি একটা গার্লস স্কুলই করবো। নারী শিক্ষার কাজ হবে তার সঙ্গে হাতের কাজ মানে তাঁতশালা - পাওয়ার লুম হবে। কুটির শিল্পের বিকাশ হবে।

বিজয় বাধা দেয়, এসব আমাদের জায়গা। গুপীনাথ বলে,

— কাজে বাধা দেবেন না। ভালো হবে না। আপনি ছেলে মানুষ। বিষয়-আশয়ের ব্যাপার তো বোঝেন না। সরে যান।

তারপর তার লোকজনদের বলে গুপীনাথ,

— কই হে আমীন। থামলে কেন? মাপজোক চালিয়ে যাও। আর ছোট তরফের জমিটারও মাপজোক কর। একলপ্তে শেড বানাতে হবে।

নরনারায়ণই এবার এসেছেন। অসুস্থ শরীর তবু এসেছেন ওই জায়গা দখল করার কথা শুনে। কিন্তু গুপীনাথই বলে,

— দলিল, পাট্টা সবই আছে বড়বাবু। আপনিই আমাকে এসব কিছু বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। দেখুন! তৈরী হয়েই এসেছিল গুপীনাথ। এতদিন ধরে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে। এখন থানা পুলিশও তার হাতে। জমিদারদের কোন প্রভাব-ই আর নেই। তারা এখন একটা বাতিল শ্রেণীর জীব। গুপীনাথ বলে,

— নিজে কাগজপত্র করে দিয়ে এখন অস্বিকার করেছেন। নরনারায়ণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

— না। নিজের বাড়িঘর নিশ্চয়ই লিখে দিইনি।

গুপীনাথ বলে,

— কাগজপত্র আছে বলেই দখল নিতে এসেছি বড়বাবু।

— দেখাও সেই কাগজ। জালিয়াত কোথাকার। গর্জে ওঠে নরনারায়ণ। বিজয় বলে,

— বাবা উত্তেজিত হবেন না। আপনার শরীর খারাপ।

— উত্তেজিত হবো না? এতবড় অন্যায় করবে?

গুপীনাথ বলে, সরে যান। সরে যান বড়বাবু। আমি বেআইনী কোন কাজ করছি না। কাজে বাধা দিলে আমি থানায় খবরও দিয়ে এসেছি তারা আপনাকে এ্যারেস্টও করবে।

— থানা পুলিশ দেখাচ্ছো? তোমার কাগজ দেখাও। নরনারায়ণ বলেন,

— নাহলে বাধাই দেবো।

— ওটা কোর্টেই দেখাবো। এ্যাই তোরা থামলি কেন? মাপজোক করে খুটি পোত।

আগে এখানে কর্তৃত্ব ছিল নরনারায়ণের। তার এক ডাকে দশবিশ জন পাইক এসে পড়তো। আজ কেউই নেই — তার বিষয় নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

তাই বাধা দিতে যায় নরনারায়ণবাবু। এবার গুপীনাথের লোকজন পুলিশই বাধা দেয়। নরনারায়ণের সামনে এসে থানার অফিসার বলেন,

— বাধা দেবেন না। কাগজপত্র ওর আছে। সরে যান।

বিজয়ও এসে দাড়িয়েছে বাবার পাশে। গুপীনাথ বলে,

— সরে যান, নাহলে দারোগাবাবু ওকে কোমরে দড়ি পরিয়ে থানায় নিয়ে চলুন। টাকা নিয়ে বিষয় বিক্রী করে বলে করিনি — জোচ্চোর।

— গুপীনাথ। মুখ সামলে কথা বলবে।

নরনারায়ণ ভুলে যায় যে তার জমিদারী আর নেই। সেই সতেজ কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে। কিন্তু নিষ্ফল সেই গর্জন। গুপীনাথের হয়ে থানা অফিসারই বলে।

— এবার এগোলে আপনাকে এ্যারেষ্ট করা হবে নরনারায়ণবাবু।

থমকে দাড়াঁন নরনারায়ণ। দেখছে ওই গুপীনাথ-অফিসারের নিষ্ঠুর মুখগুলো। আজ তার বাড়ি-ঘরই দখল করতে চায় গুপীনাথ। মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সব গেছে। এবার এটুকুও চলে যাবে তিনি দেখবেন নীরব দর্শকের মত। কোনকিছুই করতে পারবেন না। সারা শরীর কাঁপছে কী অসহ্য যন্ত্রণায়। চোখের সামনে অন্ধকার নামছে। হঠাৎ সবকিছু কেমন নিবিড় অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বিজয় বাবার জ্ঞানহীন দেহটাকে ধরে ফেলে। আর্তনাদ করে ওঠে।

— বাবা! বাবা!

কোন সাড়াই আর পায় না। দু'একজন ধরাধরি করে ওই জ্ঞানহীন দেহটাকে ঘরে নিয়ে আসে। ডাক্তারের সন্ধানে ছুটলো বাড়ির পুরোনো কাজের লোক।

ওদিকে অবশ্য গুপীনাথ তখন বিনাবাধায় মাপজোক করে চলে। বিজয়ও বিপদে পড়েছে। নরনারায়ণের জ্ঞান আর ফেরেনি। কয়েক ঘন্টা অজ্ঞান থাকার পর মারা যান। কি নিদারুণ অপমান বুকে নিয়েই তিনি এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য গুপীনাথও এসেছিল মালা নিয়ে। সে এখন যেন অন্য মানুষ। বিজয়কে বলে,

— ছোটবাবু। বিষয় আশয় নিয়ে গোলমাল তো হবেই তাই বলে ভুল বোঝাবুঝি কেন হবে? আপনি ভাববেন না। আমি তো আছি।

বিজয় অবশ্য কিছু বলেনি। বাবার শেষ কাজও যথারীতি করে সে। বাবা হঠাৎ মারা যান। বিজয় বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝে না। আরও অবাক হয় বাবা মারা যাবার কয়েকদিন পর তাদের বাড়িতে একটা চুরিও হয়ে যায়। অবশ্য তেমন কিছু সম্পদ আর নেই। চোরও বিশেষ কিছু পায় না। তবে একটা ট্যাঙ্কে কিছু কাগজপত্র ছিল। সেই ট্যাঙ্কটাই চোরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে পিছনের পুকুরের ধারে ঝোপের মধ্যে ট্যাঙ্কটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া

যায়। রাতের বেলাতেও বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টির রাতে চোর ট্যাঙ্কটা খুলে ভেবেছিল মালকড়ি ভালোই পাবে। কিন্তু টাকা কড়ি তেমন কিছু না পেয়ে বেশকিছু দলিল কাগজপত্র ছিঁড়ে খুড়ে জলে কাদায় ফেলেই চলে গেছল সেই চোর।

বিজয় সেসব কাগজ পত্রও আর উদ্ধার করতে পারেননি। সবই রাতভোর বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছল। এখন সে একা বড় বাড়িটাতো থাকতে পারে না। একদিন এখানে ছিল পূর্ণতা-আজ সেখানে হু হু শূন্যতা নামে। মনে পড়ে বাবার কথা। মাকে আগেই হারিয়েছে। বাবাই ছিল তার কাছে সব। সেই বাবাও ওই ভাবে চলে গেলেন।

এবার গুপীনাথই আসে পরম হিতকারীর মত। বিজয়ের এখন টাকার দরকার। সেও বুঝেছে গ্রামে পড়ে থাকলে আর চলবে না। জমি জায়গাও বিশেষ আর নেই। যা আছে তা চাষীদের হাতে। তারাও এখন বর্গাদার হয়ে জমির মালিক হয়েছে। গুপীনাথের দল এখন দেশ উদ্ধারের কাজে নেমে গ্রামের চাষী মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারাও এখন বলে,

— লাঙ্গল যার জমি তার।

অর্থাৎ জমির প্রকৃত মালিক তারাই। গ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বই লোপ পেতে বসেছে। এখানে না থেকে সে কলকাতাতেই যাবে নিজের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য।

ওদিকে বাগান-কাছারি বাড়ির একটা অংশ এখন গ্রাস করেছে গুপীনাথ। একটা বোর্ডও টাঙানো হয়েছে, 'নারী কল্যাণ সমিতি'। বেশ কিছু লোকজন সর্বদা থাকে। দু-চারজন অফিসারও গাড়ি নিয়ে যাতায়াত শুরু করেছে। গুপীনাথও সঙ্গে রয়েছে। কি সব কাজ কর্মের কথাও হয়। দু'দশজন মেয়েকেও দেখা যায় অফিস ঘরে।

সেদিন গুপীনাথই আসে বিজয়ের কাছে। বিজয়ের বাবার কাজকর্ম চুকে গেছে। গুপীনাথ আজ এসেছে পরম হিতৈষীর মত। বলে,

— ছোটবাবু, এসব বাড়ি - ঘর - জমি জারাত আপনার বাবা আমাকে হস্তান্তর করেছেন। কাগজপত্রও এনেছি — দেখতে পারেন।

ব্যাগ থেকে একটা দলিল বের করে। অবশ্য তাতে সই সবুতও রয়েছে নরনারায়ণবাবুর। গুপীনাথ ক'বছর আগে জমিদারী চলে যাবার সময় তাড়া

তাড়া দলিল করে অনেক খাস জমি হস্তান্তর করেছিল জমিদারী এস্টেট থেকে। তারজন্য কিছু টাকাও দিয়েছিল নরনারায়ণবাবুকে। আর বেশীর ভাগ টাকা সে নিজেই আত্মসাৎ করেছিল। সেই সময় অনেক দলিলেই সই করেছিলেন নরনারায়ণবাবু। সব দলিল পড়ার সময়ও ছিল না। গুপীনাথ তখন সদর নায়েব। তার কথা মতই সই করেছিলেন তিনি। সেই দলিলের ভিড়ে গুপীনাথও কায়দা করে এই দলিলটাও মিশিয়ে দিয়েছিল। নরনারায়ণবাবুও সই করে দিয়েছিলেন নিজের মৃত্যুদণ্ডের দলিল ওই গুপীনাথকে। এবার গুপীনাথ সেই দলিলই বের করেছে। বলে সে — দেখুন, নিজের চোখেই দেখুন - আমি মিথ্যা কথা বলছি না।

বিজয়ও দেখে দলিলটা। তার পায়ের তলের মাটি টুকুও হারিয়ে গেছে প্রায়। বাবার দুটো চা-বাগান ছিল। সেই দুটোও লীজে রয়েছে। আর মালিকও প্রায় হাতিয়েই নিয়েছে। শুধু একটা বাংলো আর সামান্য জমি রয়েছে। তাতে দিন চলবে না। গুপীনাথ বলে,

— এসবই আমার। তবু আপনি বিপদে পড়েছেন, আপনাদের নমক খেয়েছি। তাই কিছু টাকা দিচ্ছি। এটা নিয়ে এসব ছেড়ে দিয়ে ওই বাংলোতে চলে যান।

অর্থাৎ ভালো কথায় না গেলে এবার ঘাড় ধাক্কাই দেবে ওকে গুপীনাথ। বিজয়ও শুনেছে, মহিলা কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় চল্লিশ লাখ টাকাও সরকারী অনুদান আসছে। সেটা পেতে হবে গুপীনাথকে। তাই বিজয়কে তাড়াতেই হবে এই বাড়ির পুরো দখল নিতে গেলে।

বিজয়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের সবুজ গ্রাম, ওদিকে পাহাড় সীমার শুরু। ঘন সবুজ হলুদ বনে ঢাকা পর্বতসীমা আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। ওদিকে ভূটান-পাহাড়। নীচে শ্যামল উপত্যকা। কোথায় চা বাগানের সবুজ হলুদ আস্তরণ বিছানো। এই দেশ-তার ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ঘনশ্যামও দেখেছে সবকিছু। সেও হাড়ে হাড়ে চেনে ওই গুপীনাথকে। আজকাল তার রমরমাও দেখেছে। ঘনশ্যাম বলে,

— সাবজী, তুমি কিছুই করতে পারবে না। ও আগে থেকেই কৌশলে এইসব দুনম্বরী কাম করে রেখেছে, টাকাটা নাও। চলো, ওই বাগানের

লাগোয়া বাংলোতেই থাকবে। তারপর দেখা যাক, চা বাগান হাতে আসে কিনা।

বিজয়ও এসব বিষয় সম্পদের খবর জানে না। তবে শুনেছিল ওই চা বাগান তার বাবা কলকাতার কোন এক মালিককে লীজ দিয়েছিলেন। অবশ্য তার ম্যানেজার এখন বলে,

— লীজ নয়। নরনারায়ণবাবু ওই বাগান নাকি সেই মালিককে বিক্রীই করেছেন। সুতরাং ফেরৎ পাবার কথাও ওঠে না।

বিজয় সঠিক কিছুই জানে না, তবে ঘনশ্যাম বলে - উ ঝুট বলছে। কিন্তু সে সব যাচাই করার মত ক্ষমতাও নাই বিজয়ের। তাই সর্বস্ব হারিয়েই চলে যেতে হবে তাকে। এই উপত্যাকা-পর্বত ঢাকা শান্ত জায়গা থেকে সে আজ নির্বাসিত এক নতুন অচেনা জগতে।

— কি করছ বিজয় ইউ বয়?

হঠাৎ কার ডাকে বিজয়ের চমক ভাঙে। তার সেই দেশের বাড়িতে নয়। সে আজ হারিয়ে গেছে সেখান থেকে। এসেছে কলকাতার জনারণ্যে। তবে এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলিই। গাছ গাছালির ভিড়। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পাখীদের কলরবও ওঠে। অন্ধকার নেমেছে।

ঘরে ঢুকেছেন সমরজিৎবাবু। নিজেই ঘরের আলোটা জ্বালেন। দেখেন ওদিকে একটা চেয়ারে অন্ধকার ঘরে বসে আছে বিজয়। আজই ওকে পথ থেকে তুলে এনেছেন সমরজিৎ। সমরজিৎ বলেন,

— একা একা অন্ধকার বসে কি ভাবছিলে বিজয়? সমরজিতের পরণে হাফপ্যান্ট — একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। বলিষ্ঠ চেহারা। এখানেও নীচের একটা ঘরে জিমই তৈরী করেছে ছোটো খাটো। মিলিটারী থেকে রিটায়ার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু শরীরচর্চা করতে ছাড়েননি। বলেন।

— ইয়ংম্যান, কি আজে-বাজে কথা ভাবছো? পিছনের সব ভুলে এখন সামনে এগিয়ে যেতে হবে। লড়াই-এর ময়দানে পিছু হটলে চলে না, মার্চ ফরোয়ার্ড। এগিয়ে যেতে হবে। কালই কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।

বিজয়ও ভাবছে কথাটা। সমরজিৎ বলে — কি হলো?

বিজয় বলে — না। তবে শহরের কাউকে চিনি না। শুনেছি কলেজে ভর্তি হবারও অনেক প্রবলেম। আমিতো এখানে নতুন। তাছাড়া কলেজ

হোস্টেলে না হয় মেসে থাকতে হবে। সে সবেরও সন্ধান করা দরকার।

সমরজিৎ কথাটা আগেই ভেবে রেখেছেন। বলেন,

— বিজয়, আমার বাড়িতো খালিই পড়ে আছে। এখানে তোমার থাকার কোন প্রবলেমই হবে না। এখানেই থাকবে। এতদিন আমার অনেক ছিল। সে সব হারিয়ে গেছে।

— কেন? বিজয় শুধায়।

— সে সব একটা ইতিহাসই। সে কথা ক্রমশ জানতে পারবে হয়তো। তবে এখনও যা আছে আর যা পেনশন পাই তাতে কয়েকজনেরই অনেকদিন ধরে বসে খাওয়া যাবে। তুমি থাকলে আমার কোন অসুবিধা হবে না, বরং সুবিধাই হবে। তাই বলছি, তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়— এখানেই থাকবে।

বিজয়ও লোকটাকে শ্রদ্ধা করে। একদিনেই ওর যা পরিচয় পেয়েছে তাতে বুঝেছে মানুষটা একা — তবে হৃদয়বান। ওর আশ্রিত জনও কিছু আছে। মানুষকে সাহায্য করার হাত উনি বাড়িয়ে রেখেছেন। সেই হাতকে ফেরানোও কঠিন। বিজয় বলে,

— না - না। এতো আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মত লোকের আশ্রয়ে এসেছি।

সমরজিৎ বলেন — আমি লোকটা কিন্তু মোটেই ভালো নই। ভেরি হার্ড, নট টু ক্রাক। একে ভাঙতে হয়তো পারবে, মচকাতে পারবে না। কাল কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে। এদিকের একটা কলেজের প্রিন্সিপাল আমার চেনাজানা। তোমার ভর্তির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

বিজয়ও ভাবতে পারেনি যে তার থাকা-পড়ার ব্যবস্থা এত সহজে হয়ে যাবে। কলকাতার সম্বন্ধে তার একটা অবিশ্বাই ছিল। বিশাল শহর। এখানের মানুষও বিচিত্র ধরনের আর তার নমুনাও পেয়েছিল পথেই। তার সর্বস্বই লুটে নিতে চেয়েছিল, হয়তো নিত। কিন্তু এই সমরজিৎ বাবুই যেন তার জীবনে ঈশ্বর প্রেরিত কোন দূতের মত এসে তার জীবন-মালপত্র সবই বাঁচিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আজ নিরাশ্রয় পথের মানুষকে তিনি পথ থেকে তুলে এনে আশ্রয়ও দিয়েছেন। বিজয় ওই মানুষটির কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

কলকাতার এই কলেজের নাম ডাক শুনেছিল বিজয় ওই দূর মফঃস্বল কলেজে পড়ার সময়ই। সেখানের পড়া পুরো শেষ করতে পারেনি বিজয়। সেকেন্ড ইয়ারেই তার বাবা মারা যান। তাবপর ক'মাস কেটে গেছে নানা ঝামেলার মধ্যে। শেষে এসেছিল কলকাতায়। যদি এখানে পড়াটা শেষ করতে পারে। কিন্তু এবার বুঝেছে বিজয়, এখানের কোন কলেজে ওই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসে মাঝপথে ভর্তি হওয়া খুবই মুসকিল। এটা সে কোনমতেই করতে পারতো না। ফলে তার জীবনে পড়াশোনার ইতিই ঘটে যেতো। কিন্তু তা হয়নি।

এই নামী কলেজে সে সহজেই ভার্তি হতে পারে ওই কর্নেল সমরজিতের জন্য। সুন্দর খেলার মাঠও রয়েছে কলেজেব লাগোয়া। খেলাধূলার জন্যও নাম আছে কলেজের। আর সমাজের নামীদামী অনেক লোকের ছেলে মেয়েরাই এখানে পড়ে।

প্রিন্সিপ্যাল বলেন — বিজয় যে লোকের মারফৎ তুমি এই কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছ, তার নাম যেন বজায় রাখতে পারো। এই চেষ্টাই করতে হবে।

বিজয় পড়াশোনাতে বেশ মেধাবী ছাত্র। তার রেজাল্টও মন্দ নয়, আর খেলাধূলাতেও সে চৌকস। বলে বিজয়— আমি চেষ্টা করবো স্যার।

কর্নেল বলেন — চেষ্টা করলে মানুষ সব কাজই করতে পারে। তাই চেষ্টা করতেই হবে বিজয়।

কলেজের মাঠে ছেলেমেয়েদের দেখা যায়। ওদিকে ক্লাশ চলছে। কর্মব্যস্ত কলেজ। দলে দলে তরুণ-তরুণী প্রাণের উচ্ছলতা নিয়ে এখানে এসেছে।

বিজয় স্বপ্ন দেখে, সে এবার ওদেরই একজন হতে পারবে। আবার জীবন শুরু করবে সে নতুন করে নতুন এই পরিবেশে।

কর্নেল সমরজিতের এই বাড়ি, তার লাগোয়া মাঠ, এর ওদিকে বেশ কয়েকটা ঘবও দেখেছে বিজয়। ওদিকেও কিছু লোকজন থাকে। তবে তারা ওদিকেই থাকে। আসা-যাওয়ার পথও ওদিকে একটা রয়েছে। ওই পথই ব্যবহার করে তারা। তবে জায়গাটা সমরজিৎবাবুরই।

ওদেরই দু'একজন এই বাড়ির কাজকর্ম করে, বাগানে মালির কাজও করে। আর কিছু লোক কর্নেল সাহেবের একটা ছোট কারখানাও আছে

ওদিকে, সেইখানে কাজকর্ম করে। তারা কর্নেল সাহেবরই কর্মী। তাই ওদের থাকার জন্য ওই ব্যবস্থাই করেছেন কর্নেল সাহেব।

ছনু আর কালুও ওই কারখানায় কাজ করে, আর দুজনেই থাকে ওই শ্রমিক কলোনীর একটা ঘরে। অন্যদের অনেকেই স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়েই থাকে। তাদের স্ত্রীরাও আশেপাশের বাড়িতে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর রোজগারে কোনমতে চলে। ছনু আর কালুদের ওসব ঝামেলা নাই। তারা একদম ফ্রি রয়েছে তাদের ভাষায়। প্রাণখুলে মদ গিলে পড়ে থাকলেও কেউ বকা ঝকা করার নেই। এদেরও কোন মেয়েকে তারজন্য ঠ্যাঙাতেও হয় না।

ছনু-কালু দুজনই কারখানার কর্মী। ওই কারখানায় ডিফেন্সের সাপ্লাই দেবার জন্য কিছু মালপত্র তৈরী হয়। ছনু পুরানো কারিগর। লিকলিকে চেহারা। আর বুদ্ধিটাও তার খুব ধারালো। তার তুলনায় কালু একটু মাথামোটা ধরনের। তবে ছনুর শক্তি নাই কিন্তু বুদ্ধি আছে। আর কালুর বুদ্ধিটা কম হলেও গায়ে প্রচন্ড শক্তি আর সাহসও আছে। তাই দুজনে কারখানার কাজের পর মাঝে মাঝে মৌকা মাফিক কিছু চুরি-ছিনতাই-এর কাজও করে, তবে খুব গোপনে। খবরটা সাহেবের কানে গেলে মেরে তাড়িয়ে দেবে। খুব কড়া মেজাজের লোক ওই সাহেব। তাই ছনু-কালু খুব সাবধান হয়েই ওইসব কাজ করে। ছনু তালা খোলার কাজটা খুব ভালো জানে। নিপুণ কারিগর সে। তালা বানাতেও জানে, তাই সব তালা খোলাও তার কাছে খুব সহজ কাজ। ছনু তালা খুলে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে। আলমারি খোলে সহজেই। তারপর কালু বাকী কাজটা করে। কিছু দমকা রোজগারও হয় এতে।

সেদিন দুজনে যাচ্ছিল পথ দিয়ে। হঠাৎ ওই নতুন ছেলেটাকে দেখে ওর ব্যাগটা হড়কে নিয়ে কেটে পড়তে গেছিল। কিন্তু ছেলেটা যে ওই ভাবে ছনুকে ধরে ফেলবে তা ভাবেনি ওরা। তাই কালু এগিয়ে গেছিল ছনুকে উদ্ধার করতে, আর ওই সময়ই এসে পড়েছিল কর্নেল সাহেবের গাড়িটা ওইখানে। নেহাৎ পাশেই সরু আঁকা বাঁকা গলিটা ছিল, তাই মাল ফেলেই দুজনে সাহেবের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। ভেবেছিল ওসব চুকে বুকে গেছে।

কিন্তু ওই ছেলেটাকে সাহেব যে তার বাংলোয় এনে রাখবে তা ভাবেনি ছনুরা। দুপুরে দেখে ওকে বাংলোতে। চমকে ওঠে ছনু ওকে বাংলোতে দেখে। কালুকেও খবরটা জানাতে কালু বলে,

— কেউ রিস্তাদার হবে। তাই বাংলোয় এনেছে সাহেব।

ছনু বলে — যদি আমাদের দেখে সবকথা বলে দেয় ও বড়সাহেবকে। কি হবে জানি না। সাহেব লাথ মেরে ভাগিয়ে দেবে।

কালুও ভাবনাতে পড়ে। বলে সে,

—আজকের দিনটা দ্যাখ্-তারপর একটা সমঝোতাই করতে হবে ওই নতুনবাবুর সঙ্গে।

ওরা তাই বিজয়ের উপরও নজর রেখেছিল। বিজয়কে কাল থেকে কলেজে বের হতে হবে। বিকাল নামছে। কর্নেল সাহেব কোন কাজে বের হয়েছেন। বিজয় একাই মাঠের ওদিকে ঘুরছে। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। গাছ-গাছালিতে ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব ওঠে। এদিকটা এখনও নির্জন। দুধারে গাছ-আগাছাও রয়েছে।

হঠাৎ ওই আবছা অন্ধকারে সেই দুই মূর্তিকে দেখে চমকে ওঠে বিজয়। ওদের ভোলেনি সে। পথে ওরাই তার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে গেছিল। বাধা দিতে ওরাও রুখে দাঁড়ায়। আজ আবার ওদের এখানে দেখে চমকে ওঠে বিজয়।

— কি চাই?

ছনু কালুর চোখে নীরব মিনতি। এদের গলার স্বরও এখন বদলে গেছে। ছনু বলে,

— কসুর হয়ে গেছে সাব। আপনি যে কর্নেল সাহেবের রিস্তাদার তা জানতাম না। না জেনে কাল আপনার মাল টানতে গেছলাম।

কালু বলে — মাপ করে দ্যান স্যার। বহুৎ গলতি হয়ে গেছে। একাজ আর কখনও হবে না।

— ঠিক আছে। বিজয় ওদের এড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালুরাও নাছোড় বান্দা। ছনু বলে,

— এসব কথা কর্নেল সাহেবকে বলবেন না স্যার। তাহলে আমাদের নোকরীও যাবে, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন সাবজী।

কালু বলে — রুজি রুটিও চলে যাবে স্যার।

ছনুও বলে — এবারের মত মাপ করে দিন স্যার। বড় সাহেবকে কুছু বলবেন না।

বিজয় বলে — ঠিক আছে। এসব কথা আর কেউ জানবে না। তবে এসব কাজ কেন করো? চাকরী করছ তো।

ছনু বলে — মাঝে মাঝে হাত পা মিস মিস করে স্যার। তবে হামেশা করি না। নমস্তে সাব —

ওরা চলে যায় নিশ্চিন্ত হয়ে। তখন সন্ধ্যা নামছে। দেখা যায়, সাহেবের গাড়িটা ফিরছে। বিজয়ও বাড়ির দিকে ফেরে। জানে কর্নেল সাহেব ওর খোঁজ করবেন জিমে যাবার আগে। বাড়ির নীচের তলায় কর্নেল সাহেব নিজের ব্যবহারের জন্য একটা ছোট 'জিম' করেছেন। রোজ সেখানে ব্যায়াম করেন।

বিজয় ওর ঘরে বই নিয়ে বসেছে। কর্নেল সাহেব ঢোকেন। বলেন,

— কি, পড়াশোনা হচ্ছে?

বিজয় চাইল — হ্যাঁ স্যার।

কর্নেল বলেন — ওটা তো করতেই হবে। তবে ওর সঙ্গে আর একটা কাজও করতে হবে। সেটা হল ব্যায়াম — দৌড়। জিমেও যাবে। কাল সকালে উঠে দেখা হবে। হ্যাঁ, কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমি তো ছুট হাট কাজে বের হই।

বিজয় বলে — না স্যার।

— হ্যাঁ, অসুবিধা হলে বলবে। অবশ্য সবকিছুকে সহজে মানিয়ে নিতে পারাই একটা আর্ট। জীবনে অনেক বিপর্যয়ই ঘটে। সে সব কে প্রতিরোধ করে তবু এগিয়ে যেতে হবে। তাই নিজেকেও সেই ভাবে তৈরী করতে হবে। হ্যাঁ ডিনার এ্যাট এইট। ঠিক আটটার সময় ডাইনিং রুমে আসবে। সব কিছু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে করে যেতে হবে।

সকাল থেকেই বিজয়কে নিয়ে পড়েছেন কর্নেল সাহেব। সূর্য তখনও ওঠেনি। মাঠে কয়েক চক্কর দৌড়াতে হলো কর্নেলের সঙ্গে। কর্নেল অবশ্য খুঁড়িয়ে চলেন। আর দৌড়াতে হয় বিজয়কে। আবার জিমে এসে এটা-সেটা নিয়েও ব্যায়াম করতে হয়। তারপর ঝুলন্ত বালির বস্তায় পাঞ্চিং করে বক্সিং প্রাকটিস, এসব করতে ঘন্টা দেড়েকের বেশী কেটে যায়। তারপর কলেজে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে বিজয়কে। আজ প্রথম

কলেজে যাবে। তার কাছে আছে নিজের দু-তিনটে পুরানো প্যান্ট। সার্টগুলোও পুরানো। শীতের দিনের পোষাক বলতেও একটা বিবর্ণ সোয়েটার আর একটা শাল।

বিজয় সোয়েটার পরেই বের হবে। হঠাৎ কর্নেলকে দেখে প্রণাম করে। কর্নেল চাইলেন। বিজয় বলে, — আজ প্রথমদিন এখানের কলেজে যাচ্ছি। তাই আপনাকে প্রণাম করলাম।

কর্নেল সাহেব বলেন — কলেজে যাচ্ছো?

কি ভেবে বলেন — একটু অপেক্ষা করো।

উনি ভিতরে চলে গেলেন। বিজয়ও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের ভিতর থেকে কর্নেলের ডাক শুনে ভিতরে যায় বিজয়। দেখে একটা বড় আলমারী খুলে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল সাহেব। ওর ঘরে দুটো বড় সাইজের ফটো টাঙানো। তাতে টাটকা ফুলের মালা, ধূপ জ্বলছে। বলেন কর্নেল,

— আমার ছেলে সুজয় আর ওই আমার স্ত্রীর ছবি। ওরা আজ কেউ বেঁচে নেই।

কর্নেলের গলার স্বরও কেমন ভার ভার ঠেকে। কর্নেল ওই আলমারী থেকে একটা প্রায় নতুন স্যুট বের করে বিজয়কে দিয়ে বলেন,

— সুজয়ের পুরো জামা কাপড়ই তো পড়ে আছে। এই স্যুটগুলো তোমাকে হয়তো ফিট করবে। একটু পরে দেখো তো। যাও - পরে এসো। দেখি ফিট করে কিনা।

বিজয় বলে — এত দামী স্যুট!

কর্নেল হেসে বলেন — এখন আর এর দাম কি বলো, তবু তোমার কাজে লাগলে দাম কিছুটা উসুল হবে। যাও পরে এসো।

বিজয় তার ঘরে এসে স্যুটটা পরে আর অবাক হয় স্যুটটা তাকে সুন্দর ফিট করেছে। সেই সুজয়কে বিজয় কোনদিন দেখেনি, তবু মনে হয় কোন অদৃশ্য বিধাতা যেন দুজনকে এক মাপে গড়ে তুলেছিলেন।

কর্নেল সমরজিতও দেখছে বিজয়কে। তার চোখে ফুটে ওঠে সেই হারানো সুজয়ের ছবিটা। ওই বিজয় যেন বিজয় নয় — আসলে সুজয়ই। সেই নাক-মুখ-চোখ, এমনকি গলার স্বরেও একটা মিল রয়েছে। সুজয় মরেনি।

— আজ যেন সে আবার বিজয়ের রূপ ধরেই তার সামনে ফিরে এসেছে। কর্নেল বলেন,

— সুন্দর ফিট করেছে। এগুলো তুমিই ব্যবহার করো! কি হবে! পড়ে আছে। তবু তোমার কাজে লাগবে।

বিজয় বের হবে। কর্নেল বলে,

— বিজয় সাইকেলে যেতে পারো।

গ্রামের ছেলে। পাহাড়-বনে-পথে-প্রান্তরে তার সাইকেলই ব্যবহার করতো দেশে থাকার সময়।

কর্নেল সমরজিৎ ওকে নীচের তলায় নিয়ে এসে ওদিকে রাখা একটা প্রায় নতুন দামী রেসিং সাইকেল দেখিয়ে বলেন,

— ওটা তো পড়ে আছে। ওটা নিয়েই কলেজে যাতায়াত করো। ভিতরে ভিতরে গেলে সাইকেলে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। অনেক টাইম সেফ হবে। সাইকেলেই যাও। হ্যাঁ, সাবধানে যেও। কলকাতা শহর — সাবধানে সাইকেল চালাবে।

— ঠিক আছে স্যার।

বিজয় নতুন স্যুট পরে দারুণ বাহারের দামী বিদেশী রেসিং সাইকেল নিয়ে বের হলো কলেজে। কর্নেল সমরজিৎ দেখছেন বিজয়কে এক দৃষ্টে। বিজয় সাইকেল নিয়ে তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

আজকের দিনটা কর্নেল সমরজিৎ-এর কাছে নানাভাবে স্মরণীয় দিন। এই দিনটাতেই তার একমাত্র সন্তান সুজয় আর তার স্ত্রী মারা গেছিল। আর এই দিনে তিনি তাদের পাশেও উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন দূরে কোন মিলিটারী ক্যাম্পে কর্তব্যরত অবস্থায় রয়েছেন কাশ্মীরের কোন পাহাড়ে। বরফের দেশে। পাহাড় চূড়োয় জমে আছে বরফ। সেই বরফের মধ্যে তাদের এয়ার টাইট তাঁবু। দিন রাত রুম হিটার জ্বালাতে হয়। চারদিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি রাখতে হয়। মুহূর্তের অসাবধানতা ডেকে আনবে মৃত্যুকে। দেশের সীমান্তে তারা সশস্ত্র প্রহরী। পিছনে রেখে গেছিল তার স্ত্রী মনিকা আর ছেলে সুজয়কে।

কর্নেল সমরজিৎ সেনের বাবা ছিলেন বালিগঞ্জের পুরানো বাসিন্দা। তিনি অনেকদিন আগে বালিগঞ্জের ওদিকে প্রায় বিঘে তিনেক জায়গা নিয়ে বাগান সহ একটা বাড়ি করেছিলেন। তখনও এদিকে বেশ ফাঁকা ছিল। বালিগঞ্জের

অনেক সমতলে তখনও রয়েছে জলা — হোগলার বন। নতুন শহর গড়ে উঠছে। সমরজিতের বাবাও ছিলেন মিলিটারীতে। চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছিল। রিটায়ার করার পর একটু ফাঁকা দেখেই বালিগঞ্জের ওই জায়গা নিয়ে বাড়ি করেন। তারপরই ক্রমশঃ আরও দুচারজন জায়গা কিনে বাড়ি করে বসবাস শুরু করতে ওদিকেও বসত গড়ে ওঠে। সমরজিৎ তখন ছোট।

ক্রমশঃ দিন বদলায়। সময় বসে থাকে না। সে তার নিজের গতিতেই চলে। সমরজিৎ কৃতি ছাত্র। পড়াশোনাতেও ভালো। আর খেলাধূলাতেও চৌকস। কলেজের মধ্যে সবদিক থেকেই অন্যতম সেরা ছাত্র সে।

কলেজের পড়া শেষ করে বাবার কথাতেই সে মিলিটারীতে যোগ দেয়। আর দেরাদুনে চলে যায় কমিশন্ড অফিসারের ট্রেনিং নিতে। তার বাবাও এতে খুশী হন। তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের সেনাদলের ক্যাপ্টেন। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। পরবর্তী কালে তার ছেলেকেই তিনি নিজের দেশের সৈন্যদলের অফিসার হিসাবে দেখে খুশীই হন।

ছোট পরিবার। তখন বালিগঞ্জের চেহারা কিছুটা বদলে গেছে কয়েক বছরের মধ্যেই। সমরজিৎ মিলিটারীতেই রয়েছেন। বাবা তাকে সংসারী করতে চান।

মনিকা এল এই সংসারে গৃহ বধূ হয়ে। সুন্দরী - লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়েও মনিকা বাঙালী ঘরের আদর্শ বউ হয়ে ওঠে। সমরজিৎ তখন মিলিটারীর চাকরী নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছে। অবশ্য তখনই ক্যাপ্টেন হয়ে গেছে। একজন সৎ-সাহসী নিষ্ঠাবান অফিসার। আরও উপরে উঠবে সে। তারজন্য সরকারী কোয়ার্টার - অন্যসুবিধাও রয়েছে। অন্য অনেক অফিসার স-পরিবারে থাকেন। কিন্তু মনিকা কলকাতায় বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইকে একলা ফেলে রেখে বাইরে যেতে চায়নি। সে কলকাতাতেই রয়ে গেছে।

তখন সুজয় হয়েছে মাত্র। মনিকা বলে, — ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ওই মরুভূমিতে থাকতে পারবো না। তাছাড়া বাবা একা পড়ে থাকবেন।

কথাটা সমরজিৎ মেনে নেয়। তাই মনিকা কলকাতার বাড়িতেই রয়ে যায়। সুজয়ের পড়াশোনাও শুরু হয় কলকাতাতে।

সমরজিতের বাবার বয়স হয়েছে। সুজয় তখন ছোট। সমরও বাইরে। বাইরে কাজের লোক অবশ্য রয়েছে। তবু মনিকা সেই ডাক্তারের ওখানে

- ওষুধ কেনার ব্যাপারে - সংসারের নানা কাজে ছোটাছুটি করে এখানে - ওখানে। সংসারের সব দায়-দায়িত্বই সে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। তখন বালিগঞ্জের ওদিকে ফ্ল্যাট-বাড়ির ব্যবসাও শুরু হয়েছে। ওই ফ্ল্যাট কালচার ভারতবর্ষে প্রথম গড়ে ওঠে বিদেশের অনুকরণে বোম্বাই শহরেই।

কলকাতার মানুষ ফ্ল্যাট বিক্রীর কথা প্রথমে ভাবতেও পারেনি। জায়গার চাহিদাও ছিল কম। নিজের নিজের বাড়ির মালিকরাই বাড়িতে থাকতো - দু'চারখানা ঘর ভাড়া দিত। ক্রমশঃ কলকাতাতেও জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। জায়গাও সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে একটা জায়গাতেই পাঁচতলা বাড়ি তুলে পায়রার খোপের মত ফ্ল্যাট তৈরী হতে লাগলো, আর সেসব ফ্ল্যাটও বিক্রী হয়ে গেল রাতারাতি। সেই সঙ্গে মালিকও মোটা টাকাই লাভ করলো অনায়াসে। এত সহজে লাখলাখ টাকা কামাবার ধান্দাটা বুঝে ফেলতেই এবার বহু লোকই এই জমি বাড়ি কিনে তাতে আট-দশতলা বাড়ি বানিয়ে লাখ লাখ টাকা কামাবার পথই নিল। তারাই এবার সন্ধান করতে লাগলো জায়গা বা পুরানো বাড়ি। সেইসব জায়গা চড়া দামে কিনে ফ্ল্যাট উঠতে শুরু হয়েছে। হাওয়ায় উড়ছে লাখ লাখ টাকা।

ব্রজকিশোর এতদিন টুকটাক নানা ধান্দা করেছে। কখনও সাপ্লাই-এর কাজ কখনও ঠিকেদারী — কখনও জমি - বাড়ির দালালি করেছে। তবু ভাগ্যের চাকাটাকে ফেরাতে পারেনি। অবশ্য তার জন্য ব্রজকিশোরের স্বভাবটাই দায়ী। লোকটা লোভী আর ফন্দীবাজ। মাল ঠিকমত না দিয়েই সে অফিস থেকে বাবুদের ঘুস দিয়ে পুরোটাকার বিল বের করে নিত। ঠিকেদারীর কাজেও যথাসাধ্য ফাঁকি দিয়েই টাকা আদায় করতো অফিসারদের খুশী করে। কাজের থেকে অকাজের দিকেই তার বেশী নজর ছিল। ব্রজকিশোরের দাদা নন্দকিশোর ছিল ঠিক তার ভাই-এর বিপরীত মেরুর লোক। নন্দবাবু ছিলেন সৎ-কর্মঠ। নিজে ইঞ্জিনিয়ার। নিজের চেষ্টায় আর এক বাল্যবন্ধু সেই নরনারায়ণ বাবুর সহযোগিতায় সে নিজের কারখানা গড়ে তোলে। তার ওখানেই কাজ করতো ব্রজকিশোরও।

কিন্তু ব্রজকিশোরের রক্তে রয়েছে চুরি-অন্যায় কাজ করার প্রতি বেশী টান। ফলে দাদার ফার্মেও সে নানা দু'নম্বরী কাজ শুরু করে। এমনকি মাল তৈরীর ব্যাপারেও ঠিকমত মানের কাঁচামাল ব্যবহার না করে সস্তার কাঁচামাল

ব্যবহার করে মালের তৈরীর খরচা থেকে সেই টাকা মারতে থাকে। ফলে নানা পার্টির কাছ থেকে অভিযোগও আসতে শুরু হয়। এবার নন্দবাবু নিজেই তদন্ত শুরু করেন এইসব গুরুতর অভিযোগের।

নন্দকিশোর বুঝতে পারে এবার ব্রজকিশোরের খেলা। কিন্তু কোন প্রমাণই রাখেনি ব্রজ। চতুর লোক সে। সাবধানে সব কাজ করে। তাই হাতে নাতে ধরা পড়ে না। অবশ্য নন্দবাবুও ব্যাপারটা বুঝে এবার, বজ্রকিশোরকেই কারখানা থেকে সরিয়ে দেন।

বজ্রকিশোর অবশ্য এর মধ্যে বেশ কিছু টাকা হাতে এনেছে। আর তার নানা অপকর্মের ব্যাপারেও বেশ কিছু দু-নম্বরী লোকদেরও হাতে এনেছে। অন্ধকার পথে যারা কাজ করে তারা জানে অন্ধকারের জীবদের হাতে রাখতেই হবে। কারণ লোকদের চমকে-ধমকেই তাদের কাজ উদ্ধার করতে হয়।

বজ্রকিশোর-এর সন্ধানী চোখে পড়ে এই বাড়ি তৈরীর কাজটা। অবশ্য বজ্রকিশোর নন্দকিশোরের কারখানা থেকে বিতাড়িত হলেও প্রকাশ্যে দাদা বা তার পরিবারের সঙ্গে কোন অশান্তিহ করেনি। দাদা যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই কথাটাও মনে রাখেনি সে। বরং অন্য ব্যবসা করলে ও আলাদা থাকলেও বজ্রকিশোর দাদার বাড়িতে আসে। বৌদিকেও বলে,

— দাদা কারখানা নিয়ে থাকুন। আমি এবার বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ব্যবসাতে নেমেছি। দাদাও সাহায্য করেছে। এই ব্যবসাতে ভালো আমদানী হলে দু'ভায়ে এতেও নামবে।

নন্দবাবুর স্ত্রী গ্রামের মেয়ে। সে ব্যবসার মার-প্যাচ বোঝে না। সংসার আর তাদের একমাত্র মেয়েকে নিয়েই থাকে। প্রিয়া স্কুলে পড়ছে। ব্রজকিশোর তাকেও আদর করে বাড়িতে এলে। বজ্রকিশোর খুবই সারধানী আর চতুর। দাদার এই অপমানটা সে ভোলেনি। মনের অতলেই চেপে রেখে হাসিমুখে এ বাড়িতে আসে। নিজেই নয় — ব্রজ তার স্ত্রী ললিতাকেও বলে,

— ও বাড়িতে যাতায়াত করবে। বৌদি-প্রিয়াদের সঙ্গে মেলামেশাও রাখবে।

ললিতা অবশ্য ব্রজের মত এত ভাবনা চিন্তা করে পথ চলে না। সে বলে,

— বড়লোক দাদা বৌদির পিছনে আর কেন? কারখানা থেকে তো তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাকে। আর কিসের সম্পর্ক?

হাসে ব্রজকিশোর। বলে,

— এরজন্যই মেয়েদের এগারো হাত কাপড়েও কাছা দিতে জোটে না। আরে, ওরা না হয় জবাব দিয়েছে — আমাকে তো জবাব দিতে হবে। তার জন্য ওঁৎ পেতে আছি। ও তুমি বুঝবে না। তাই বলছি তুমি যাবে। যাতায়াত রাখবে। আখেরে কাজ দেবে!

ব্রজকিশোর এবার নিজেই বিল্ডিং তৈরীর ব্যবসাতে নেমেছে। এর মধ্যে কোন এক বৃদ্ধের জমিও হাতিয়েছে তাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে। আরও দেখা যায় এর কিছুদিন পর সেই ভদ্রলোকও মারা যান। অবশ্য তার সৎকার করে ব্রজই। আর শ্রাদ্ধও করে ঘটা করে। আর সে-ই ওই জমির মালিক হয়ে যায়। অনেকেই এ নিয়ে অনেক কথা বলে। ব্রজ এসব কথা গায়ে মাখে না। সে এর মধ্যে আরও দুখানা বাড়ির কাজ শুরু করেছে। নিজের গাড়িও করেছে।

মনিকার শ্বশুরমশাই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসহায় মনিকা। ভর দুপুরে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। পাশের জমিতে তখন ব্রজবাবুর বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে। ব্রজই এগিয়ে আসে। তার ড্রাইভারকে বলে,

— বৌদিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা।

মনিকাও এসময় ব্রজকে এগিয়ে আসতে দেখে তার সাহায্য নেয়। ব্রজকিশোরও এবার মনিকার শ্বশুরের জন্য সবকিছুই করে। তাকে দামী নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। ভূপালে সমরজিতকে ফোন করে বাবার খবর দেয়। সমরজিতও এসে পড়ে।

কিন্তু তিনি এসে বাবাকে আর দেখতে পান না। সেই দিন সকালেই তার বাবা মারা গেছেন। ব্রজকিশোরই সব ব্যবস্থা করে। সমর কলকাতায় থাকে না। একা মনিকা কি করে? এই সময় ব্রজই সমরের পাশে দাঁড়িয়ে সব কাজকর্ম করে। সমরজিতও কৃতজ্ঞ।

কটাদিন যেন ঝড়ের মধ্যে কেটে যায়। সমরজিতও বুঝতে পারে না যে তার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। তাকে ভূপালে ফিরতে হবে তার সদর দপ্তরে। এতদিন তবু বাবা ছিলেন বটবৃক্ষের মত। বাড়িতে তবু একজন অভিভাবক

ছিলেন। এবার তিনিও নেই। এখন কলকাতার এতবড় বাড়িতে থাকতে হবে মনিকা-সুজয়কে নিয়ে।

ব্রজকিশোর এর মধ্যে অনেক কাছে এসে গেছে। এখন সে এদের পরিবারের বন্ধুই। ব্রজের স্ত্রী ললিতাও আসে মনিকার কাছে। সুজয়কেও সে চেনে। মনিকাই বলে সমরকে,

— আমি এই বাড়িতে দিব্যি থাকবো কাজের লোক বনমালী আর ভুবনের মাকে নিয়ে। আর ললিতাদি-ব্রজদাও আছেন। কোন অসুবিধা হবে না। সুজয়ের পড়াশোনার অসুবিধা হবে ওখানে গেলে। কটা বছর কোনভাবে কেটে যাবে। ব্রজও বলে — সেই ভালো সমরবাবু। বৌদি এখানেই থাকুন। আমরা তো রয়েছি। কোন অসুবিধা হবে না।

সমর বলে—ব্রজদা, বৌদি, আপনাদের ভরসাতেই মনিকাদের রেখে গেলাম।

ব্রজবাবুও অভয় দেয় — ওদের জন্য ভাববেন না।

সমর ফিরে যায় ভূপালে।

এখন দেশের অবস্থাও বদলেছে। এতদিন ধরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর দু'একটা যুদ্ধই হয়েছে মাত্র। তাও পাকিস্থানের সঙ্গে। সেইসব যুদ্ধও তেমন ভয়াবহ রূপ নেয়নি।

ব্রজকিশোরের মুখে এক আর মনে অন্য কিছু। সেটা সে সাবধানে চেপে রাখতে পারে। এতদিন ধরে ব্রজ তার মনের অতলের সেই লোভটাকে চেপে রেখেছে। তার নজর ছিল সমরবাবুর ওই বড় রাস্তার উপর প্রায় চার বিঘে জমি-বাড়ির উপর। ওই জমির দাম কোটি টাকার উপর। আর ওখানে একটা মার্কেট-হাউসিং কমপ্লেক্স করতে পারলে প্রায় দশ বারো কোটি টাকার কাজ হবে। ওটা জমি-বাড়িই নয়— ব্রজবাবুর কাছে ওটা সোনার খনি। তাই এবার ব্রজকিশোরও ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। তবে সাবধানে।

সমরজিৎ ছোটবেলা থেকেই বাইরে মানুষ হয়েছে। তারপরে চলে গেছে মিলিটারীতে। সে বিষয়-আশয়ের কিছুই বোঝে না। সমরের বাবা বাড়ির দলিলপত্র — অন্যসব কাগজপত্র এখানেই রাখতেন। এবার বাবা মারা যাবার পর ব্রজই বলে সমরকে,

— সমরবাবু, বাবা তো গেলেন। এখন থেকে বিষয়-আশয় বাড়ি এসব

কর্পোরেশন অফিসে মিউটেশন করিয়ে নিজের নামেই করে নিন। আপনি তো বাইরে বাইরে থাকেন। বৌদিকে বলে যান।

সমরও ব্রজকে বিশ্বাস করে। বলে সে,

—মনিকা, ব্রজদার সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে ওসব আমাদের নামে মিউটিশন করিয়ে নাও।

ব্রজ বলে — ট্যাক্স বিলও করিয়ে দেব আপনাদের নামে। কিছু কাগজপত্র এনে দেব সই করে দেবেন। বাকী কাজ আমি বৌদিকে নিয়ে গিয়ে করিয়ে দেব। কোন অসুবিধা হবে না। কর্পোরেশনে আমার চেনাজানা লোকজনও আছে।

সমর বলে — তাই করো।

সমর চলে গেছে। এবার ব্রজই নিজে উদ্যোগী হয়ে মনিকাকে নিয়ে যায় কর্পোরেশন অফিসে। ব্রজের লোকজন সেখানে ফিট করাই আছে। কারণ বিল্ডিং তৈরীর ব্যবসাতে নানা কিছু বেআইনী কাজই করে তারা পয়সার বিনিময়। ব্রজকিশোর সেই চক্রের একজন। তারা জানে কিছু পয়সার বিনিময়ে এখানে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়।

ব্রজ বলে — বৌদি, কাগজ পত্রগুলো ওদের অফিসে রেখে যান। সাতদিনের মধ্যেই আমিই সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, ওদের কিছু টাকা দিতে হবে। কেরানী ভদ্রলোকও বেশ বিনীত ভাবে বলে,

— আমরা কিছু পেয়ে থাকি।

অর্থাৎ এটা যেন ওদের ন্যায্য পাওনা। মনিকা ব্রজের দিকে চাইল। ব্রজ বলে,

— এরা তো অনেক টাকাই নেন। তবে আমার চেনাজানা। আপাতত হাজার পাঁচেক টাকা দিন। কাজ হয়ে গেলে আরও কিছু দেবেন।

মনিকা টাকাটাও বের করে দেয় সেই ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক টাকাটা নিয়ে ড্রয়ারে চালান করে অভয় দেয়, — সাতদিনের মধ্যে সব হয়ে যাবে। কাগজপত্রও ফেরৎ নিয়ে যাবেন। নমস্কার।

পাঁচহাজার টাকার দামী একটা নমস্কার ছুঁড়ে দেয় ভদ্রলোক মনিকার দিকে।

এরপরই শুরু হল ব্রজকিশোরের খেলা। কদিন আর দেখাই নেই তার।

পাশের বাড়ির কাজও শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যে। সেই ফাঁকা জায়গাতে উঠেছে তিনখানা বড় বড় সাততলার ম্যানসন। সেখানে গড়ে উঠেছে অনেক ফ্ল্যাট বাড়ি। সেইসব ফ্ল্যাটে লোকজনও এসে গেছে। শান্ত সবুজের কোন চিহ্নই আর নেই। সেখানে মাড়োয়ারী-গুজরাতি-সিন্ধী-পাঞ্জাবী-বাঙালী নানা প্রদেশের লোকজন এসে বাসা বেধেছে। নানা ধরনের গাড়িও পার্ক করা থাকে। গেটে সেন্ট্রিও রয়েছে। কর্মব্যস্ত একটা কলোনী। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। ব্রজকিশোরের অফিসও আর নেই। এখন সেটা হচ্ছে এই হাউসিং এস্টেটের অফিস।

মনিকাও দেখে ব্রজকিশোরের যাওয়া-আসা কিছুটা কমেছে। মাঝে মাঝে আসে। মনিকা বলে, — ব্রজদা কাগজপত্রগুলো অফিসে রয়েছে। ওরা এখনও কিছু করেনি। ওসব তো করাতে হবে। টাকাও দিয়ে এলাম।

ব্রজ বলে — ওদের ওই কাজ। আঠারো মাসে বছর।

ভাববেন না বৌদি। আমি কালই অফিসে গিয়ে দেখছি। যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাই করছি। সমরদার খবর পেলেন?

মনিকা বলে — হ্যাঁ। ও লিখেছে হয়ত ওকে এবার কাশ্মীরেই যেতে হবে। কি সব কাণ্ড যে ঘটছে সেখানে।

ব্রজ জানে সেই খবর। ক্রমশঃ কাশ্মীরকে নিয়ে এবার পাকিস্থান জল ঘোলা করতে শুরু করেছে। প্রকাশ্য যুদ্ধে সেবার নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে পাকিস্থান। পূর্ব পাকিস্থানে ভারতীয় সৈন্যের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। তারপর পূর্ব পাকিস্থানও হারাতে হল পাকিস্থানকে। সেখানে জন্ম নিল নতুন এক রাষ্ট্র। পাকিস্থান এই অপমানের বদলা নেবার জন্যই কাশ্মীর নিয়ে মেতে উঠেছে। সেখানে চলেছে ছায়াযুদ্ধ।

পাকিস্থানী মদতে সেখানে পাকিস্থান থেকেই ঢুকছে জঙ্গীর দল - হানাদারের দল। মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কাশ্মীরে। এবার ভারতীয় সেনা বাহিনীকেও সেখানে জঙ্গী দমনে মোতায়েন করা হয়েছে। তবু জঙ্গীরা আক্রমণ চালাচ্ছে গোপনে। ক্ষয়-ক্ষতিও হচ্ছে।

ব্রজ খবরটা শুনে মনে মনে খুশীই হয়। জঙ্গীদের আক্রমণে অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছে সেখানে। সমর যদি মারা যায় তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। ব্রজের পক্ষে এই সোনার খনি দখল নেবার সুবিধা হবে। কারণ তখন বাধা

দেবার মত বিশেষ কেউ থাকবে না। মনিকা আর নাবালক সুজয়কে ব্রজকিশোর দরকার মত ব্যবস্থাই করে দেবে।

মনিকাও বিপদে পড়েছে। ব্রজকিশোরও কদিন আসেনি। মনিকা এবার নিজেই যায় পাশের ওই ব্যস্ত কমপ্লেক্সে ব্রজের সন্ধানে। সেখানে হয়তো ব্রজবাবুকে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানের লোকজন বলে,

— তারা তো সব ফ্ল্যাট বিক্রী করে চলে গেছেন। অন্য কোথাও কাজ করছেন জানিনা। ব্রজবাবু আর এখানেও আসেন না।

মনিকা এবার প্রমাদ গণে। সব কাগজপত্র ওর হাতে। অফিসেও গেছিল মনিকা। সেখানে গিয়ে শোনে যে ব্রজবাবুই কাগজপত্র সব নিয়ে চলে গেছেন। আর নাকি মিউটেশনও হয়ে গেছে। তবে অন্য নামে। সেখানে সমরজিৎ - মনিকার নামও নেই। নতুন ভদ্রলোক খাতা খুলে দেখাতে মনিকা চমকে ওঠে।

—তাহলে কি হবে এখন?

ভদ্রলোক বলেন — কাগজপত্র থাকলে কোর্টে যান। এখন জল তো অন্যদিকে গড়াচ্ছে।

অর্থাৎ বিপদেই পড়েছে মনিকা। সুজয় তখন মাধ্যমিক দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক ভর্তি হয়েছে। সেও কাগজপত্রের কিছুই বোঝে না। সমরজিতও কাশ্মীরে গিয়ে ক্যাম্পে আছে। সেখান থেকে চিঠিও আসে মাঝে মাঝে। ফোনেও কথা হয়। সেই ফোনে কথা বলার সময়ও মনিকা পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলা কামানের আওয়াজ শুনে বুঝেছে সমর কোন সীমান্ত ঘেঁসা জায়গাতেই রয়েছে তাঁবুতে। সেখান থেকে পাক সৈনিকদের ছোঁড়া গোলার আওয়াজও আসে ফোনে। ভারতীয় সৈন্যরাও এদিক থেকে গোলাগুলি ছুঁড়ছে।

মনিকা এই অবস্থায় সমরকেও এতবড় বিপদের কথা জানাতে পারেনি। নিজেই চেষ্টা করছে যেভাবে হোক যদি ব্রজের খবর পায়। সেইসব কাগজপত্র উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু ব্রজের কোন খবরই নেই — দেখাও নেই। মনিকার এক প্রতিবেশী মিঃ রায় সব শুনে বলেন,

— লোকটার নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। মিসেস সেন, আপনি থানাতেই খবর দিন। সমরবাবু মিলিটারীর পদস্থ অফিসার। তিনি এখন

সীমান্তে রয়েছেন। আপনার এই বিপদে পুলিশ সাহায্য নিশ্চয়ই করবে। তারা ব্রজবাবুকে খুঁজে বের করবেই। আপনি থানাতেই যান।

মনিকা সেইমত থানাতেই যায়। থানার একজন অফিসারকে মনিকা সমস্ত ঘটনা জানায়। অফিসারও তাকে বসিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শোনে। কিন্তু ব্রজকিশোর বাবুর নাম শুনে কেমন যেন একটু ফিউজ হয়ে যান। ওই নাম শোনার পর আগেকার সেই সেবা করার উৎসাহে বেশ ভাটাই পড়ে গেছে। ভদ্রলোক বলেন,

— তিনি যে আপনার কাগজপত্র নিয়েছেন তার কোন প্রমাণ আছে?

মনিকাও অবাক হয় ওর কথায়। বলে সে,

— কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে কিছু নিলে তার কোন প্রমাণ রেখে যাবে না। আমি তাকে দিয়েছি ওসব কাগজপত্র বিশ্বাস করে। কর্পোরেশন অফিসেও নিয়ে গেছিলেন আমায়। তারপর আর ওসব ফেরৎ দিচ্ছেন না। দেখাও করছেন না। আমি একজন অসহায় মহিলা। স্বামীও ফ্রন্টে রয়েছেন। আশাকরি, পুলিশ একজন দেশসেবক পদস্থ সৈন্যর জন্য ন্যায় বিচার করবেন।

পুলিশ অফিসার বলে — নিশ্চয়ই! এতো আমাদের কর্তব্য। ঠিক আছে। আমরা কেস লিখছি। তদন্তও করবো। আপনি কদিন পর খবর নেবেন। আর আপনার ফোন নাম্বার তো দরখাস্তেই রয়েছে। এরমধ্যে আমরা কোন খবর পেলে আপনাকে জানাবো।

— অনেক ধন্যবাদ। একটু চেষ্টা করুন, যাতে ওই লোকটা আমাদের কোন ক্ষতি না করতে পারে।

— সিওর! আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো ম্যাডাম। নমস্কার।

অফিসার মনিকাকে অনেক আশা ভরসার কথা শুনিয়েই বিদায় করে ফোন তোলে ব্যাপারটা ব্রজবাবুকে জানাবার জন্য। তিনিও ব্রজবাবুর কাছে নানা ভাবে কৃতজ্ঞ। ব্রজবাবু এখন অন্যদিকে দু'তিনটে বিল্ডিং-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তবু তাকে সাবধান করতেই হবে। তাই সরকারী ফোন থেকেই ব্রজবাবুকে খবরটা জানিয়ে দেয় সেই ভদ্রলোক।

মনিকা সেদিন সকালে বাড়িতে রয়েছে। সুজয়ও স্কুলে। হঠাৎ বেলটা বেজে ওঠে কর্কশ স্বরে। মনিকা কাজের মেয়েটাকে বলে,

— কে দ্যাখ তো। এসময় আবার কে এল?

কাজের মেয়ে দরজাটা খুলতেই ঢুকেছে ব্রজকিশোর। ক'মাসেই ওর দেহে মেদের সঞ্চার হয়েছে। পরণের স্যুটটাও দামী। মনিকা ভাবতেও পারেনি যে ব্রজ এসে হাজির হবে। হয়তো থানা থেকেই তাকে খবর দিয়েছে। ব্রজ অবশ্য থানা পুলিশের কথা কিছুই বলে না। বলে,

— এদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম বৌদির খবর নিয়ে যাই। বৌদি, এই জায়গাটা নিয়ে অফিসে অনেক গোলমাল বের হয়েছে।

— মানে? মনিকা অবাক হয়।

ব্রজ বলে—মানে আপনার শ্বশুরমশাই যাদের কাছ থেকে জায়গাটা কিনেছিলেন—তারা দুই ভাই। ছোট ভাই-এর ছেলেটা বলছে বাবা ওই জায়গা বিক্রী করেননি। ওই জায়গায় তাদের অংশ রয়েছে। ওরাও ওই জায়গার অর্দ্ধেকের মালিক।

মনিকা বলে — সেকি! এতদিন তারা কোন কিছু বলেনি। হঠাৎ আজ বলছে এসব কথা!

এতদিন তো জায়গা জমির দাম ছিল না। এখন লাখ লাখ টাকা দাম।

মনিকা দেখছে ব্রজকিশোরকে। ব্রজকিশোর বলে,

— তাই বলছি বাড়িটা বিক্রী করে দিন।

মনিকা বলে — উনি তো এখন ফ্রন্টে। এখন উনি আসতেও পারবেন কিনা জানি না। উনি না এলে কিছু করাও যাবে না। উনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

ব্রজকিশোর বলে, — ম্যাডাম, ওই আগেকার পার্টিও ঝামেলা শুরু করবে। তাই বলছি আপনিই এটা লিখে দিন। পরে আমি সব সামলে নেব। আপনিও লাখ দুয়েক টাকা পাবেন আর একটা ফ্ল্যাটও দেবে টালিগঞ্জের দিকে। আপনার জন্যই বলছি। আমি কাল তৈরী হয়ে আসবো।

মনিকা চুপ করে থাকে। ব্রজকিশোর যেন তাকে একটু শাসিয়েই চলে গেল।

মনিকা সেই দিনই ফোন করে সমরকে। সহজে ফোনও পাওয়া যায় না। খুব ব্যস্ত লাইন। তবু বহু চেষ্টা করে ধরে সমরকে। রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে সেই দূর থেকে বোম ফাটার শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। সমর

তখন গোলায় বর্ষণের মাঝে জওয়ানদের পরিচালনা করছে। ওদিকে ফায়ারিং চলছে। গোলার শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। রাতের অন্ধকারে বাতাসে গোলা ফাটছে। শত্রুরা এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এরাও ওদের প্রতিহত করে এগিয়ে চলেছে।

মনিকার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,

— ওই ব্রজকিশোর বাবুই আমাদের বাড়ি জমি সব দখল করতে চায় শাসানিও দিচ্ছে।

সমর বলে — ভয় পাবে না। বাড়িও ছাড়বে না। থানাতেই যাও। আমিও খবর দিচ্ছি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। একটা ব্যবস্থা হবেই। কিছুদিন আটকে রাখো। যুদ্ধ শেষ হলেই কলকাতায় ফিরবো। কোন ভয় নেই ব্রজকিশোর কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু ব্রজকিশোর তখন কলকাতার বুকে কিছুটা পা রেখেছে তার টাকার জোরে। আর সমাজের একটা শ্রেণী তখন জমি বাড়ির দখল পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে টাকা-লোক বলেরও অভাব নেই প্রশাসনকেও টাকার জোরে কিনে নিয়েছে ব্রজকিশোর ও তার মদতদারের দল। থানা পুলিশও এখন ওই শ্রেণীর কাছ থেকে নিয়মিত মাসহারা পায় তার পরিমাণও অনেক। তাই তারাও এখন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে

ব্রজকিশোরও এরমধ্যে সরকারী দপ্তর থেকে খবর নিয়েছে যে সমরের বাবা ওই জমি-বাড়ি মনিকার নামেই উইল করে গেছে। অর্থাৎ মনিকাকে হাতে আনলেই ওই সোনার খনির মালিক হতে পারবে সে। সমরজিৎকে তার দরকার নেই। মনিকাকেই যে ভাবে হোক চাপ দিয়ে সই করাতে পারলে এখানে তার দশকোটি টাকার প্রজেক্টের কাজ শুরু করতে পারবে। তাই সব আটঘাট বেঁধেই এগোতে চায় ব্রজকিশোর।

মনিকাও থানাতে এসেছে। অবশ্য থানা অফিসার এর আগেই ব্রজকিশোরের কাছে সব শুনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। ব্রজকিশোরকে বলে অফিসার.

— আমি যেভাবে হোক ঝুলিয়ে রাখবো। কিন্তু ব্রজবাবু, ওনার স্বামী যদি ফ্রন্ট থেকে উপরওয়ালাদের জানান, হয়তো কড়া স্টেপই নিতে হবে

ব্রজও বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে,

— যুদ্ধ করছে বলে কি আমাদের মাথা কিনে নিয়েছে! আরে বাবা

ও না হয় পাহাড়ে পর্বতে লড়ছে আর আমরা? আমরাও তো এখানেই লড়াই করেই দুটো পয়সা কামাচ্ছি। ওদের বেলাতেই যত আইন। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি!

অফিসার বলে, — তাই বলছি, বেশী জানাজানি হবার আগেই কোনমতে চাপ দিয়ে সইটা করিয়ে নিন। নাহলে ঝামেলা বাড়বে।

ব্রজ বলে — দেখছি। তবে আপনি একটু ঝুলিয়ে রাখুন। অবশ্য ঠিকমত কাজ হলে আপনাকেও খুশী করে দেব।

অফিসার বলে,

— একটা টু-রুম ফ্ল্যাট খুঁজছি আমার সম্বন্ধীর জন্য।

ব্রজকিশোর বলে,

— হয়ে যাবে। আমাকে একটু মদত দিন, ওসব হয়ে যাবে। অফিসারও খুশী হয়।

পরদিনই আসে মনিকা থানাতে। নিজেই একটা কমপ্লেন লিখে এনেছে। ওই বাড়ী বিক্রীর জন্য তাকে বেআইনী ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তার স্বামী এখন কারগিল ফ্রন্টে। অসহায়া মনিকাদেবী তাই পুলিশের সাহায্য চায়। থানা অফিসার দরখাস্তটা দেখে বলেন,

— আপনার দরখাস্ত মত আমরা তদন্ত শুরু করছি ম্যাডাম। এ খুবই অন্যায়।

মনিকাও যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বলে সে,

— তাই করুন। দেশে কি আইন কানুন নেই।

— নিশ্চয়ই আছে! আপনি ভয় পাবেন না। আমরা ব্রজবাবুকে থানায় ডেকে এনে বলছি এসব কাজ যেন না করেন।

সুজয় স্কুলের থেকে বিকালেই বাড়ি ফেরে অন্যদিন। আজ বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে গেল, সুজয় তখনও ফেরেনি। সন্ধ্যা হয়ে যায়, সুজয়ের দেখাই নেই। এবার ভাবনায় পড়ে মনিকা। স্কুলেও ফোন করে। হয়তো প্রাকটিক্যাল ক্লাশে আটকে পড়েছে। কিন্তু স্কুল থেকে জানায় একজন কর্মী. যে স্কুলে আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। সুজয়ও নেই।

মনিকা এবার তার পরিচিত দু-একজনের বাড়িতেও ফোন করে,

কিন্তু সেখানেও কোথাও যায়নি। তারাও সুজয়ের কোন খবর দিতে পারে না।

মনিকার এবার ভয়ই হয়। কাগজেও দেখেছে সে অপহরণের নানা ঘটনা ঘটছে শহরে। তেমনি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা কে জানে। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকই ওকে নিয়ে থানায় আসে।

সেই অফিসার তখন ডিউটিতে নেই। রয়েছেন অন্য একজন। মনিকা তাকেই সব ঘটনা বলতে তিনি মিসিং ডায়রী করে নিয়ে বলেন,

— আমরাও খোঁজ খবর করছি। আর আপনিও আপনার চেনা জায়গাতে খোঁজ করুন। যদি কোন খবর পান, জানাবেন।

মনিকা বাড়ি ফেরে চিন্তিত মনে। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেল বেজে ওঠে। মনিকার বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে, হয়ত সুজয়ই ফিরেছে। সে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে দরজা খোলে। দেখা যায় ব্রজকিশোরকে। সেও চিন্তিত কণ্ঠে বলে, — শুনলাম সুজয়কে পাওয়া যাচ্ছে না বিকাল থেকে।

মনিকা ব্রজবাবুকে দেখে যেন ভরসা পায়। তবু চেনাজানা লোক। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে তার বিপদের সময়। মনিকা বলে,

— বিকালে স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। আজ আসেনি।

— খোঁজ খবর করছেন? কোন বন্ধু, মনে হয়, এখন তো বড় হয়েছে — কোন বান্ধবীর সঙ্গে কোথাও যায়নি তো?

ব্রজের কথায় মনিকা বলে,

— কোথাও গেলে বাড়িতে বলে যায়। আজ কিছু বলেও যায়নি। ব্রজ বলে — ভাবনার কথা! যা দিনকাল পড়েছে।

মনিকাই বলে — থানাতেও ডায়রী করেছি।

— ওরা কি করবে? ব্রজ বলে। তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে বলে ব্রজকিশোর।

— আমার চেনাজানা এক পুলিশ অফিসার আছে। তার কাছেই চলো। কর্তাদের চাপ না থাকলে এরা কিছুই করবে না। ওখান থেকে ফোন করাতে পারলে থানাও নড়ে চড়ে বসবে।

তখন রাত প্রায় নটা বাজে। মনিকার তখন মনে সুজয়ের চিন্তা। কোথায়

গেল ছেলেটা। বাবাও নেই। সব দায়দায়িত্ব তারই উপর। নিজের কথা ভাবার সময় তার নেই। মনিকা বলে,

— তিনি কিছু করতে পারবেন?

— নিশ্চয়ই! আমার খুব চেনাজানা। আমি বললে না করতে পারবেন না। একটা ব্যবস্থা হবেই।

মনিকাও বাড়ির দরজা বন্ধ করে ব্রজকিশোরের গাড়িতে এসে উঠলো। গাড়িটা রাতের আলো ঝলমল কলকাতার পথ দিয়ে ছুটে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়িটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে গড়িয়া ছাড়িয়ে চলেছে। এখানে শহরের কোলাহল আলো তত নেই। গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোটবাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছে। অবশ্য বাগান ততখানি আর নেই। মাঝে মাঝে দু'চারটে মিট মিট করে আলো জ্বলছে। আবার ছায়াঘন অন্ধকারে ভাঙ্গা চোরা গাড়িটা এগিয়ে চলেছে। হেড লাইটের আলো পড়ছে গাছ গাছালির ঝোপের বুকে।

মনিকা বলে·— এ কোথায় যাচ্ছি ব্রজবাবু?

ব্রজ বলে,

— সেই পুলিশ সাহেব ওদিকে একটা বাংলো করেছেন। ওই বাংলোতেই যাচ্ছি।

— আর কতদূর! ভীত কণ্ঠে মনিকা প্রশ্ন করে।

ব্রজ বলে — ওই তো এসে গেছি।

গাড়িটা একটা পাঁচিল ঘেরা সাবেকী ধরনের বাড়িতে ঢুকলো। একটা লোক গেট খুলে দেয়, গাড়িটা ঢুকতে আবার গেটটা বন্ধ হয়ে যায়। দুদিকে গাছ। অন্ধকারে বাগানের আসল রূপটা চোখে পড়ে না। গাড়িটা এসে সেই বাংলোর সামনে দাঁড়ায়।

— আসুন।

ব্রজ দরজা খুলে মনিকাকে নিয়ে নেমে ভিতরে যায়।

পুরানো হলঘরটা শূন্যপ্রায়। একটা টেবিল আর তিন-চারটে সাবেকী আমলের কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতেও ধুলোর আস্তরণ। এগুলো বিশেষ ব্যবহৃত হয়না বলেই মনে হয়। শিলিং থেকে তার দিয়ে একটা বাল্ব ঝোলানো। তার থেকে মিটমিটে একটা আলো পড়ছে মেঝেতে। ঘরের শূন্যতা তাতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

মনিকা বলে — এ কোথায় এলাম?

ব্রজ বলেন — ঠিক জায়গাতেই এসেছেন ম্যাডাম। সুজয়কেও পেয়ে যাবেন। ভয় নেই।

— সুজয় কোথায়? মনিকা উৎকণ্ঠিতা স্বরে প্রশ্ন করে।

ব্রজকিশোর বলে — এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সুজয়কে পাবেন। সুজয় এখানেই রয়েছে।

তারপর গলা তুলে কাকে বলে ব্রজ — এ্যাই, ছেলেটাকে নিয়ে আয়।

মনিকাও অবাক হয়। বলে,

— সুজয় এখানে এল কি করে?

এরমধ্যে দুজন লোক সুজয়কে নিয়ে আসে। সুজয়ের চোখে যেন কিসের ঘোর। ঠিকমত চাইতেও পারছে না। চেহারাও বিদ্ধস্ত। জামাটাও ছেঁড়া। মনে হয় ওরা জোর করেই সুজয়কে তুলে এনেছে। সহজে ও আসতে চায়নি। ওরা কোন ওষুধ খাইয়ে অর্দ্ধ অচৈতন্য করেই গাড়িতে তুলেছিল, আর এখনও সেই ওষুধের ঘোরেই রয়েছে সুজয়। মনিকা আর্তনাদ করে ওঠে,

— ওকে ছেড়ে দিন। দয়া করে গাড়িতে তুলে দিন। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাবো। তারপর দেখবো কে বা কারা একে এইভাবে তুলে এনেছে।

ব্রজ বলে ওঠে,

— আস্তে—আস্তে ম্যাডাম। নো চেঁচামেচি। শান্তিতে কাজ করতে হয়। সুজয়কে পাবেন। তবে তার আগে একটা সই করতে হবে। চুপচাপ দলিলে সই করে দিয়ে ছেলেকে নিযে বাড়ি চলে যান। এ নিয়ে আর কোন গোলমাল করলে ছেলেও আর পাবেন না। সই করুন —

এবার ব্রজকিশোর মনিকার সামনে বাড়ি বিক্রীর দলিলটা এগিয়ে দেয়। মনিকা দলিলটা দেখেই গর্জে ওঠে,—এত নীচ, লোভী আপনি ব্রজবাবু! ওই বাড়ি জমি জোর করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান এইভাবে চাপ দিয়ে।

ব্রজ বলে,

— সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটাকে একটু বাঁকাতে হয় ম্যাডাম।

নিন সই করুন। দু'লাখ টাকা ক্যাশ একটা ফ্ল্যাটও পাবেন। আর এ নিয়ে কোন গোলমাল করবেন না।

— না! আমি সই করবো না। না—কিছুতেই না।

মনিকার সামনে এবার ওরা সুজয়ের কপালেই পিস্তল ধরে। ব্রজ বলে কঠিন স্বরে,

— দশ পর্যন্ত গুনবো। এর মধ্যে সই না করলে পিস্তলের একটা গুলিতে আপনার ছেলের খুলি উড়ে যাবে। আর তোমাকেও ছাড়বো না। সই করলে তবু মা ছেলেতে বাঁচতে পারবে। কি করবে ভেবে দ্যাখো—

এবার মনিকাও ভাবছে কথাটা। ওরা তার সুজয়কে মেরে ফেলবে। তাকেও। সই করলে তবু বেঁচে যাবে তারা। বাড়ি আবার হবে। কিন্তু প্রাণ গেলে প্রাণ আর ফিরে আসবে না। সামনের মেঝেতে রাখা আছে সুজয়ের দেহটা। অস্ফুট আর্তনাদ করছে সে। মনিকা বলে,

— ওকে ছেড়ে দাও। আমি সই করছি।

ব্রজ বলে — দ্যাটস্ লাইক অ্ গুড গার্ল। সই কর — মনিকা দলিলে একটা সই করে দিতে ব্রজ এবার দলিলটা নিয়ে ব্যাগে পুরে বলে,

— এবার ছুটি। যাও এবার। তোমাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাই করছি। ম্যাডাম — আপনার দু'লাখ টাকা কালই পৌঁছে যাবে। আর নতুন ফ্ল্যাটের চাবিও।

মনিকা রাগে গজগজ করছে। সে জানে সুজয়কে এখান থেকে নিয়ে বের করতে পারলে সে সিধে চলে যাবে থানায়। ব্রজকিশোরের ব্যবস্থাই করবে। সমরকেও ফোন করবে আজই।

একটা গাড়িও তৈরী ছিল। ওদের সেই গাড়িতে তুলে দিয়ে ব্রজ বলে ড্রাইভারকে,

— ঠিকঠাক পৌঁছে দিবি এদের। যেন কোনও ঝামেলা না হয়।

লোকটার গাল কাটা — চোখ দুটে যেন সাপের চোখের মত জ্বলছে। বলে সে,

— ঠিক আছে বস। আমি ঠিকঠাক পৌঁছে দেব।

ওরা বের হয়ে যায়। রাত তখন গভীর। পথ-ঘাটও শুনশান। তাই সরু পথ, দুদিকে ঘেরা বনজঙ্গল, কোথাও পুকুর। সেই পথে জোরে চলছে গাড়িটা।

সুজয় মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। তখনও অস্ফুট আর্তনাদ করে চলেছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। গাড়িটা চলেছে জোরে। একটা বাঁকের মাথায় দেখে মনিকা ওই ধাবমান গাড়ি থেকে দরজা খুলে ড্রাইভার লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে আর গাড়িটা বাঁদিকে বাঁক নিয়েই উঁচু রাস্তা থেকে সবেগে নীচে একটা জলাশয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলিয়ে যায়। মনিকা আর্তনাদ করে সুজয়কে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু করার কিছুই নেই। গাড়িটা ওদের নিয়ে প্রায় আট দশ ফিট জলের তলে পড়েছে। বের হবার পথও নেই। মনিকার দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে নিবিড় অন্ধকার। জলের তলেই মা ছেলের ঠিকানাও হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

পরদিন সকালে ওই পুকুরের ধারের কিছু লোকই ঘটনাটা জানতে পারে। লোকজন জুটে যায়। ওই এলাকার পুলিশও এবার এসে ক্রেন দিয়ে গাড়িটা তোলে। আর গাড়ির মধ্যে পাওয়া যায় মনিকা-সুজয়ের মৃতদেহ। মনিকার ব্যাগের কাগজপত্রে তাদের ঠিকানা পেয়ে এই থানাকেও জানায় ওখানের পুলিশ। কিন্তু দেখা যায় গাড়ির নাম্বার প্লেটটাই জাল। ড্রাইভারকেও পাওয়া যায় না।

যে রাতে মনিকা আর সুজয় এইভাবে মারা গেছিল, সেইরাতে মেজর সমরজিৎ তখন বরফ ঢাকা পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে উপরে উঠছে তার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে। অন্ধকারে বরফ ঢাকা পাহাড়ের থেকে আলোর আভাস ওঠে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচে। বুকে দম লাগে। হাঁপাচ্ছে তারা। ওদিক থেকে শত্রুদের গুলি-কামানের গোলার ঝলকা বুক কাঁপানো শব্দ ওঠে।

ওই চূড়া থেকেই পাক সেনাদল গুলি চালাচ্ছে। ওদের পিছন দিক থেকে উঠছে তারা। নীরব নিঃশব্দ পরিবেশ। চূড়াটা আর একটু উপর। ওরা বরফের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ওই ঠাণ্ডায় চলেছে। সমরজিৎ মরণপণ লড়াই করে এগোচ্ছে। শত্রুরাও ওদের উপস্থিতির খবর জানতে পেরে আক্রমণ করছে।

কিন্তু এরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাক সেনার উপর। এদের আক্রমণে বিধ্বস্ত তারা। গুলিতে আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আর হাতের মুঠোয় এই আটনম্বর ঘাটি দখল করতে পারলে যুদ্ধ ফাতে হয়ে যাবে।

সমরজিৎ গর্জন করে—চার্জ—জয়হিন্দ—আগে বার—

ওরা এগিয়ে চলেছে হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগে সমরজিতের পায়ে।

পড়ে যায় সে। ওর প্যান্ট ভিজে গেছে। তবু দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তার এস-এল-আর থেকেও গুলি চলছে। একজন সহকারী ধরে ফেলে ওকে।

— স্যার, আপনি আহত।

— দ্যাটস্ নাথিং — গুলি চালাও। এই পিক আমাদের এখন। ক্লিয়ার দেম আউট।

আট নম্বর পিক সেই রাতে জয় করেছিল সমরজিৎ। তাকে হাসপাতালে আনা হয়। গুলিও বের করা হয়। কিন্তু বাঁ পাটা একটু অকেজো হয়ে যায়। তাকে মিলিটারী থেকে রিটায়ার করতে হবে কথাটা ভেবেই দুঃখ পায় সমর। তার ওই কৃতিত্বের জন্য সরকারও তাকে কর্নেলের পদে প্রমোশন দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সমরজিৎ তখন হাসপাতালে। এই সময়ই ঘটনাটা ঘটে যায় কলকাতায়। মনিকা-তার ছেলে সুজয় নাকি গাড়ি এ্যাকসিডেন্টেই মারা গেছে। পুলিশের এক মহল এই রিপোর্টই দেয়। এইসব তদন্ত রিপোর্ট পেতেও সময় লাগে।

এর মধ্যে সমরজিতও কিছুটা সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফেরে। তখন দেখে সেই পৈত্রিক বাড়িটা আর নেই। তাদের বাড়ি ভেঙ্গে মাঠ করে সেখানে নতুন ম্যানসন তৈরী হবার তোড়জোড় চলছে।

সমরজিৎ-এর সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। মনিকাও নেই। একমাত্র সন্তান সুজয়ও চলে গেছে। আর পুলিশও বলে, — আমরা তদন্ত করেছিলাম, কিন্তু ওটা স্যার নিছক এ্যাকসিডেন্টই। ওখানের পুলিশও এই রিপোর্ট দিয়েছে।

সমরজিৎ বলে,

— কিন্তু গাড়িটা কার? কেন ওরা ওইখানে গেছিল?

তার খবরও জানা যায়নি। অফিসার জানায়। সমরজিৎ অবশ্য ব্রজকিশোরের সন্ধানও পেয়েছে। কিন্তু ব্রজকিশোর সেই দলিল দেখিয়ে বলে,

— ম্যাডাম আমাকে ওই প্রপার্টি বিক্রী করে গেছেন। তা রেজিস্ট্রিও হয়ে গেছে। আমি তাকে টাকাও দিয়েছি। তারপর তার এ্যাকসিডেন্ট হল। কি ভাবে হল তাতো জানি না স্যার।

সমরজিৎ বলে,

— তার বিক্রী করার দরকারই ছিল না।

— সেটা আমি জানি না স্যার। দলিল তো দেখালাম। ভিতরে কোন রহস্য ছিল কিনা জানিনা।

আইনত কোন ফাঁকই নেই। তবু সমরজিৎ পুলিশ কমিশনার - মন্ত্রী, অনেকের কাছেই গেছল সুবিচার পাবার আশায় কিন্তু প্রমাণ কিছু দিতেও পারেনি। তাই ওই শয়তান ব্রজকিশোরের কোন শাস্তিই হয়নি।

সমরজিতের বাবার শহরতলীতে আরও কিছু জায়গা ছিল। সেখানে একটা বড় প্লাইউডের কারখানা-করাতকল এসব ছিল। ওই বালিগঞ্জের বাড়ি হারিয়ে —মনিকা—সুজয়কে হারিয়ে এই খানেই এসে রয়েছে। টাকার তার দরকার নেই। নিজেও অনেক রোজগার করেছে। পেনশনও ভালোই পায়। তবু কিছু পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্যই ওই কারখানা-করাতকল সে চালু রেখেছে।

সব হারিয়ে ওই ছন্নছাড়া কিছু মানুষদের নিয়েই দিন কাটাচ্ছে। আর সেই ছন্নছাড়াদের দলে এসে আশ্রয় পেয়েছে আর একজন। সে ওই তরুণ বিজয়।

আজ ওই বিজয়ের মাঝেই সমরজিৎ যেন সুজয়কে ফিরে পেয়েছে। শুনেছে বিজয়ের ইতিহাস। সে এক যন্ত্রণা-বঞ্চনার ইতিহাসই। সমাজ বিজয়কে কিছুই দেয়নি। বিজয়ের কথা শুনে সমরজিতেরও মনে হয়েছিল, সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ থাকে। অন্যদের সর্বস্ব লুটকরা-অন্যদের বঞ্চনা করার অধিকার তাদের জন্মগত।

সমরজিতও সেই শ্রেণীর শিকার। বিজয়েরও সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথে বের করে দিয়েছে। সমরজিৎ তাই বিজয়ের সঙ্গে নিজের একটা নিবিড় সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। তাই এই জীবন সংগ্রামে তিনিও বিজয়কে একজন প্রতিবাদী সৈনিক হিসাবে তৈরী করতে চান।

সমরবাবু ওই মনিকা আর সুজয়ের ঘটনাটাকে ভুলতে পারেননি। তার প্রতিদিনের কাজের মধ্যেও বারবার মনে পড়ে ওদের মুখ। সেই ফ্রন্টে-যুদ্ধের রাতে শেষবার মনিকার কথা শুনেছিল — 'আমাদের খুব বিপদ'। সমরজিৎ তখন দেশের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। পাহাড়ের উপর থেকে হানাদারী শত্রুসৈন্য তাদের দিকে সেল ছুঁড়ছে। সেই মৃত্যুদুতকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে জয়ী হয়েছিল। এরজন্য তার প্রিয় সাথীদের কয়েকজনকেও হারাতে হয়েছে। যে দেশের জন্য তার মরণপন লড়াই সে দেশের মানুষই

তার স্ত্রীপুত্রকে কৌশলে হত্যা করেছে। তার যথা সর্বস্ব লুটে নিয়েছে। অথচ সমরজিৎ তবু দেশের স্বাধীনতা — সার্বভৌমতাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু দেশ তাকে দেখেনি। সে আজও তার স্ত্রী-পুত্রের হত্যাকারী—তার সর্বস্ব লুণ্ঠনকারীদের কোন সাজাই দিতে পারেনি। অসহায়ের মত নীরবে সেই বেদনাটাকে বুকে চেপেই রেখেছে।

বিজয়ও তার অত্যাচারীদের অত্যাচারে ঘর ছেড়েছে। এসে জুটেছে সব হারিয়ে এখানে।

ব্রজকিশোর এখন সমাজের নামী দামী লোক। এখন তার নানা ব্যবসা। বিল্ডিং-এর ব্যবসা ছাড়া এখন তার প্রধান ব্যবসা ওই কারখানার তৈরী মালপত্র নিয়েই। আর ঈশ্বরও তাকে যেন সমীহ করে চলে। তাই অনায়াসেই তাকে অনেক কিছুই পাইয়ে দেন সেই ঈশ্বর নামের অদৃশ্য কোন মহাজন। তাই ওই বিশাল কারখানাও ব্রজকিশোরের হাতে পাকা ফলের মত হাতে এসে পড়েছে আর ব্রজও সেটাকে দখল করেছে অনায়াসে।

তার দাদা নন্দকিশোরবাবু এই কারখানার পত্তন করেন তার বন্ধু নরনারায়ণবাবুর টাকা নিয়ে। দুজনে ছিলেন এই কারখানার অংশীদার। অবশ্য নরনারায়ণ কোনদিন সামনে আসেননি। তিনি টাকা দিয়েছিলেন বন্ধুকে। নন্দবাবু নিজে ইঞ্জিনিয়ার আর সৎ-পরিশ্রমী লোক। তিনিই কারখানা চালাতেন। সকলে জানতো ওরই কারখানা।

অবশ্য নন্দকিশোরবাবু বন্ধুকে ফাঁকি দেননি। নিজেদের মধ্যে তিনিই কাগজপত্র করিয়ে নরনারায়ণকে পার্টনার করেছিলেন, আর গ্রামে থাকলেও বছরের শেষে বেশকিছু টাকা ঠিক পৌঁছে যেত নরনারায়ণবাবুর কাছে।

নন্দকিশোরের ভাই ব্রজকিশোরকে নন্দবাবুই দয়া করে তার কারখানাতে চাকরী দিয়েছিলেন। ব্রজকিশোরও করিতকর্মা লোক। সে ক'বছরেই কারখানার সব কাজ জেনে ফেলেছিল। কারখানার জন্য নন্দকিশোর দিনরাত খাটেন। কারখানা বড় হচ্ছে। আরও জায়গা জমি নিয়ে নতুন সেকশন গড়ে উঠেছে। ব্রজকিশোরও দাদাকে দেখায় সেও প্রকৃত কাজের লোক।

ব্রজকিশোরের এসব ভান মাত্র। নিজেকে কাজের লোক প্রতিপন্ন করে সে এবার তার খেলা শুরু করে। নানা ভাবে কোম্পানীর কয়েকলাখ টাকার

মাল অন্যত্র বেচে দেয়। নন্দকিশোরবাবুর নজরে পড়তে এবার ব্রজকিশোরও বিপদে পড়ে। বলে ব্রজকিশোর,

— কোম্পানীর কিছু অসাধু লোক এইসব চুরি করছে। ওই চোরগুলোকে আমি খুঁজে খুঁজে তাড়াবো দাদা। দূর করে দেব ব্যাটাদের।

নন্দবাবু অবশ্য তার আগে সব তদন্তই করেছেন। তার নিজের লোকজন দিয়ে সেই তদন্তের রিপোর্টও পেয়েছেন। ব্রজকিশোর যে কারখানার মধ্যে দু'তিনজনকে নিয়ে বেশ প্ল্যান করে লাখ লাখ টাকার মাল সরিয়ে মিঃ আগরওয়ালের গুদামে রেখেছে, সেই খবরও পেয়েছেন। আর পুলিশকে দিয়ে রাতারাতি সেইসব মাল সিজ করিয়ে মিঃ আগরওয়ালকেও এ্যারেস্টও করিয়েছেন। ব্রজকে তাই বলেন নন্দবাবু,

— এসব কাজ তোমাকে আর করতে হবে না। মিঃ আগরওয়াল নিজেই সব স্বীকার করেছেন।

চমকে ওঠে ব্রজকিশোর — মানে! তাহলে এসব কাজ করেছে আমাদের সাপ্লায়ার শান্তিলাল আগরওয়াল!

নন্দবাবু বলেন,

— তিনি তোমার নাম, তোমার সহকারীদের নামও বলেছেন।

— এসব মিথ্যা কথা! ব্যাটা নিজে ধরা পড়ার ভয়ে এখন আমাকে ফাঁসাতে চাইছে দাদা। বিশ্বাস করো—আমি এসবের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

নন্দকিশোর সেইদিনই ব্রজকিশোরকেও কারখানার চাকরী থেকে বরখাস্ত করে বলে,

— পুলিশেই দিতাম। ভাই বলে ছেড়ে দিলাম। তোমাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। যাও আর কোনদিন এখানে এসো না।

ব্রজকিশোরকে নন্দবাবুই তাড়িয়ে দেন কারখানা থেকে। ব্রজকিশোরের স্ত্রীও খবরটা জানতে পারে। সেও বেশ সাবধানী চতুর মহিলা। বলে,

— এত করলে দাদার জন্য! দাদা তো কারখানা থেকে চোর বদনাম দিযে তাড়ালো! এসবের মূলে তোমার বৌদিও আছে। কারখানার মালকিন হয়ে তিনি তো ধরাকে সরা দেখছেন। তিনিই সাতখানা করে তোমার নামে দাদাকে লাগিয়ে এই কাণ্ড করেছে! এখন কি করবে?

ব্রজকিশোর অবশ্য টাকাকড়ি ভালোই হাতিয়েছে। আব এর মধ্যে ওই

আগরওয়ালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দু'একটা জমি নিয়ে বাড়ি তৈরীর কাজও শুরু করেছে। পয়সার মুখও দেখেছে। ব্রজ বলে,

— বিল্ডিং-এর ব্যবসা শুরু করেছি। আর দেখবে একদিন কারখানার মালিকও হবো। সেদিন দেখিয়ে দেব দাদাকে ব্রজকিশোর কি করতে পারে।

ব্রজর স্ত্রী ললিতা বলে,

— থাক্ - থাক্! আর ফাঁকা আওয়াজ করে কাজ নেই। ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দই সার।

ব্রজ বলে — আওয়াজ দিচ্ছি না। দেখবে আমার দিনও বদলাবে।

ব্রজকিশোর এখন বিল্ডিং-এর ব্যবসাই করছে। দাদার সঙ্গে ওর যোগাযোগ তবু রেখেছে। মাঝে মাঝে যায়ও নন্দকিশোরের বাড়িতে। নন্দকিশোর তার কারখানাকে আরও বাড়িয়েছে। তার প্রডাক্টের দামও আছে বাজারে, চাহিদাও।

নন্দকিশোর বাবুর স্ত্রীও কিছুদিন থেকে অসুস্থ। ছোট মেয়ে প্রিয়া তখন স্কুলে পড়ছে। নন্দবাবুও দিনরাত কারখানার কাজ ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীর দিকে নজর দেবার সময়ও তার নেই। তাই আয়া-নার্সই রেখেছেন নন্দবাবুর স্ত্রীর দেখাশোনার জন্য।

কিন্তু মাইনে করা লোক দিয়ে সংসার চালানো যায় না। তাই এই সংসারের হালও বেহাল হয়ে ওঠে। প্রিয়ার দেখা শোনাও করতে পারে না তার মা বৈশাখী। ফলে সংসারে এখন শুধু বিদ্ধস্ততার ছাপই ফুটে ওঠে।

নন্দকিশোর দিনভোর অফিস কারখানায় হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বাড়ি ফিরে দেখে বৈশাখীকে ঠিকমত ওষুধ খাওয়ানো হয়নি। নার্সও চলে গেছে কি অজুহাতে সেদিন। প্রিয়ারও খাওয়া দাওয়া ঠিকমত হয়নি। বাড়ির রান্নার লোকও ছুটি নিয়েছে। ফলে নন্দকিশোরকেও টোস্ট আর স্যালাড খেয়েই রাত কাটাতে হয়। বৈশাখীও বিছানায় শুয়ে দেখে সব। সেই-ই বলে,

— এ বাড়িতে একজন কর্ত্রী না থাকলে সংসার তো ভেসে যাবে। একজনকে দরকার যে একটু দেখাশোনা করতে পারবে।

ব্রজকিশোরও আসে এখানে। এখন তার নিজের ব্যবসাপত্র ভালোই চলছে। তার বিল্ডিং-এর ব্যবসাতে আয়ও হচ্ছে ভালোই। নিজে গাড়িও করেছে। দাদার কাছে তার প্রত্যাশা কিছু তেমন নেই। তবু দাদার খবর নিতে

আসে কর্তব্যপরায়ণ ভাই হিসাবেই। ব্রজও এই সংসারের বেহাল অবস্থা দেখে মনে মনে খুশীই হয়। বৌদিরও শরীর খারাপ। ব্রজই বলে,

— বৌদি ঠিকই বলেছো। আমি বরং ললিতাকে কিছুদিন এখানে পাঠিয়ে দিই। ও বাড়িতে তো কাজ তেমন নেই। ও এখানে এসে কিছুদিন তোমার কাছে থাকুক। তুমি সুস্থ হলে ও চলে যাবে।

বৈশাখীও এমনই কিছু ভাবছিল। ললিতা কদিন থাকলে তারও সুবিধা হবে। সংসারের হাল সেই-ই ধরতে পারবে। বৈশাখী বলে,

— তাহলে তো ভালই হয়। কিন্তু ললিতা কি আসতে পারবে?

ব্রজ বলে — কেন পারবে না! তোমাদের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবে না তা কি হয়। তুমি ভেব না বৌদি। আমি গিয়ে বলছি ললিতাকে। তাকে এখানে এসে থাকতে হবে এসময়।

অবশ্য নন্দকিশোর সব শুনে স্ত্রীকে বলে,

— আবার ওদের আনবে। একা ব্রজকে আমি তো এনে দেখেছিলাম। কিন্তু কি করে গেছিল তাতো জানো। তাই ভয় হয় আবার যদি কিছু করে।

বৈশাখী বলে,

— না-না। ব্রজ তো থাকছে না। ললিতাই থাকবে এ বাড়িতে। সংসারের কাজকর্ম একটু দেখে শুনে করিয়ে নেবে। নিজে তো কিছুই দেখতে পারি না, কি যে হচ্ছে বাড়িতে! একজন মেয়েছেলে নাহলে কি সংসার চলে। বৈশাখী সংসারের কথাই ভাবছে। ভাবছে ওদের সুখ-সুবিধার কথা। নন্দকিশোর বলে,

-- ঠিক আছে। তবে তুমি ওর উপর একটু নজর রেখো। ওই ব্রজকে আমি আর বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, ওর একটা রাগ হয়েছে আমাদের উপর। বৈশাখী বলে,

— ব্রজ তো এখন নিজেই ভালো ব্যবসা করছে। ওরও অভাব নেই।

— কিন্তু মানুষের স্বভাব তো বদলায় না। তাই ভয় হয়। তবে শেষ পর্যন্ত নন্দকিশোর অসুস্থ স্ত্রীর কথাই মেনে নেয়। ললিতা আসে ওদের সংসারে।

সকালে আসে ললিতা। দিনভোর বাড়িতে থাকে। এখন এই বাড়ির ছন্নছাড়া ভাবটাও আর নেই। ব্রজও আসে মাঝে মাঝে। এখন নন্দও দেখেছে যে তার সংসারের হালও বদলেছে। ললিতার নজর সব দিকে। বাড়ির কাজের

লোকজনও খুশী। তারা ক্রমশঃ যেন জেনেছে ললিতাই এই বাড়ির কর্ত্রী। বৈশাখীর শরীর অবশ্য ভেঙে পড়েছে। ব্রজই বলে নন্দকিশোরকে,

— দাদা, ওই ডাক্তারবাবুকে দিয়ে বৌদির চিকিৎসা হবে না। এতদিন ধরে উনি বৌদিকে দেখছেন। কোন উন্নতিই হচ্ছে না। কোন বড় ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

নন্দকিশোর তখন কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। ওর কারখানার জন্য আই-এস-ও সার্টিফিকেট বের করতে হবে। তাহলে ওর মাল প্রতিরক্ষা বিভাগও কিনবে। প্রায় কোটি টাকার মত। সেইসব নিয়েই ব্যস্ত। নন্দকিশোর বলে,

— আমার তো সময় নেই। তেমন বড় ডাক্তারকে তাহলে দেখাবার ব্যবস্থা কর। টাকার জন্য ভাবিস না।

নন্দকিশোরও অজানতে ব্রজের উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ব্রজই এবার অন্য ডাক্তারকে আনে।

ললিতাও এই সংসারের এখন কর্ত্রী। আলমারীর চাবিও এসে উঠেছে তার হাতে। প্রিয়াও এখন খুশী। প্রিয়ার উপরেও কাকীমার সাবধানী নজর রয়েছে। প্রিয়া মায়ের স্নেহ ভালবাসা তেমন পায়নি। একটা দিক তার কাছে শূন্যই ছিল। ললিতা সেই শূন্যতা যেন পূর্ণ করেছে তার জীবনে। ললিতারও নজর আছে প্রিয়ার দিকে।

— ওই শাড়ি পরে কেন নেমন্তন্ন যাবে, এই দামী শাড়িটা পর। আর গহনাও।

ললিতাই যেন প্রিয়াকে মনের মত করে সাজাতে চায়। এই প্রীতির স্পর্শও প্রিয়ার মনে সাড়া আনে।

ব্রজ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে চলেছে। যে সব কিছু করে একেবারে প্ল্যান মাফিক। তাই নতুন ডাক্তার এনেছে সে ব্রজের নিজের লোক। ওষুধপত্রও দিচ্ছে। কিন্তু ব্রজ এরমধ্যে সেইসব ওষুধ বদলে শিশিতে জলই পুরে দেয়। না হয় সব ওষুধও দেয়না বৈশাখীকে। ফলে বৈশাখীর শক্তিও ধীরে ধীরে কমে আসছে আর ব্রজও সেইটাই চায়।

কারখানার সরকারী স্বীকৃতি মিলেছে বহু প্রচেষ্টার পর। নন্দকিশোরও খুশী। এবার প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকেও মোটা টাকার অর্ডার পেয়েছে তারা। এমনি দিনে হঠাৎ ফোন আসে কারখানায় বাড়ি থেকে, বৈশাখীর খুব বাড়াবাড়ি।

উনি যেন চলে আসেন বাড়িতে। নন্দকিশোর বাড়ি এসে দেখে তখন সব শেষ। বৈশাখীর প্রাণহীন দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে প্রিয়া। ললিতার চোখে জল। ব্রজকিশোরও রয়েছে। বলে সে,

— এত চেষ্টা করলাম দাদা, বৌদিকে আটকাতে পারলাম না। তিনি চলে গেলেন।

ব্রজ দেখছে বৈশাখীর প্রাণহীন দেহটাকে। এবার মনে হয় সংসার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বৈশাখীর প্রতি করণীয় কোন কর্তব্যই তিনি করেননি।

বৈশাখী নেই। এখন এই বাড়িতে ললিতাই কর্ত্রী। ব্রজও আসে মাঝে মাঝে। প্রিয়ার জীবনেও ললিতা বিশেষ ঠাঁই করে নিয়েছে। ব্রজ কিশোর এবার আরও সাবধানে পা ফেলেছে। ক্রমশ দাদার সংসারের সব ভারই তুলে নিয়েছে সে। আর দেখেছে নন্দকিশোরকে কোনমতে হঠাতে পারলে ব্রজই আসবে এই বাড়িতে।

নন্দকিশোরকে অবশ্য ব্রজ কোন মতেই ঘাটায় না। তবে দাদার ব্যবসার সব খবরই সে রাখে। সেই কারখানার দু'এক লোককেও ব্রজ মাসে মাসে টাকা দেয়। তারাই ভিতরের খবরও এনে দেয়।

নন্দকিশোর এবার বিরাট একটা লটের মাল অর্ডার পেয়েছে। অনেক টাকার দরকার। এতদিন তাকে টাকা যুগিয়েছে নরনারায়ণ। কিন্তু জমিদারী চলে যাবার পর তার অবস্থাও ভালো নয়। ফলে নন্দকিশোর ব্যাঙ্ক থেকেই বেশ কিছু টাকা লোন নিয়েছে। তবে সে জানে মাল ডেলিভারী দিলেই টাকা পাবে। ব্যাঙ্কের দেনাও শোধ করে দেবে।

তবু একটা টেনশন রয়ে গেছে। নন্দকিশোরও চিন্তিত। আর ব্রজও জানে খবরটা। এবার ওই নন্দকিশোরকেই সরাতে হবে। বৈশাখীকে সরিয়ে ললিতাকে ব্রজকিশোর এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবার দাদাকে কৌশলে সরাতে পারলে ব্রজকিশোরই হবে ওই কারখানার মালিক। তবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ব্রজকিশোর অপেক্ষা করছে ওই মাল ডেলিভারী হবার জন্য। তাহলে নন্দকিশোরের হাতে প্রচুর টাকা আসবে আর বিনা ঝুঁকিতে সেই টাকা মায় কারখানা সবই দখল করতেপারবে ব্রজকিশোর।

নন্দকিশোর দিনরাত পরিশ্রম করে প্রডাকশন বাড়িয়ে এসব মাল ডেলিভারী দিয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগও খুশী হয় ওর মালের গুনগত মান দেখে। আরও

অর্ডার পায় আর টাকাও। নন্দকিশোর খুশী। এমনি দিনে খবর আসে নরনারায়ণ বাবু মারা গেছেন গ্রামের বাড়িতে। নন্দকিশোর আজ এখানে উঠেছে বন্ধুর সাহায্যের জন্যই। নরনারায়ণের কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাই চমকে ওঠে। শরীরটাও তার হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। ব্রজকিশোরও ছুটে আসে দাদার অসুস্থতার খবর পেয়ে। বলে,

— দিনরাত এত কাজ করছ। এবার কিছুদিন বিশ্রাম নাও দাদা।

নন্দবলে — সময় নেই রে। কালই বাইরে যেতে হবে।

ব্রজ বলে — কদিন বিশ্রাম নাও। এখন কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। শরীর মোটেই ভালো নেই। শুনলে তো ডাক্তারও বলে গেল তোমাকে রেস্ট নিতে।

— নারে! যেতেই হবে। নন্দকিশোরের মনে পড়ে নরনারায়ণের কথা। আজ সে নেই। তার ছেলে বিজয়ও এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। এখন নন্দকিশোরকে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে হবে। দরকার হলে বিজয়কে কলকাতার বাড়িতেই আনবে। এখানে রেখেই তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে।

এবার নন্দকিশোরও ভাবছে ভবিষ্যতের কথা। এতবড় কারখানা — ব্যবসা এসব তার অবর্তমানে দেখতে হবে প্রিয়া আর বিজয়কেই। তাই এখন থেকেই বিজয়কে এখানে এনে কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার কাজও শেখাবেন। আজ নরনারায়ণ নেই। নন্দকিশোরের দায় দায়িত্বও বেড়েছে।

অবশ্য ব্রজকিশোর এসব খবর জানেন না। শুধু জানে দেশের বাড়িতে দাদা মাঝে মাঝে যায়। এবার ব্রজও তৈরী হচ্ছে। এখন কারখানার অবস্থাও ভালো। দাদা কারখানাকে ভালো অবস্থায় এনেছে। টাকাও এসেছে অনেক। তাই ব্রজ এবার অসুস্থ দাদাকে সেদিনের অপমানের জবাব দিতে চায়। এবার ওই কারখানাই আসবে তার হাতে।

নন্দকিশোরকে ওষুধপত্র দেয় নার্স। ললিতাই এসব ব্যবস্থা করেছে। ব্রজকিশোরও আসে-যায়। এবার ব্রজই দাদাকে কয়েকটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। বলে,

— একটু ঘুমাও তো। দিনরাত খালি কাজ আর কাজ।

সেই ঘুম আর ভাঙ্গে না নন্দকিশোরের। ব্রজের টাকার জোরও আছে। আর এখন তার নিজের ওই বিল্ডিং ব্যবসাও ভালোই চলেছে। তাই তার

কাছে পাপপুণ্য এসবের চেয়ে টাকার মহিমাই বেশী। সেও জানে টাকার জোরে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

তাই ব্রজকিশোরও নন্দবাবুর এই মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলেই চালিয়ে দিল। এমন হত্যা-খুন সে এর আগেও করেছেন। ওই বালিগঞ্জের জায়গাটা নেবার জন্য সে মনিকা-সুজয়কেও কৌশলে শেষ করেছিল। পুলিশও কিছু করতে পারেনি। বৈশাখীকেও মারতে হয়েছে। এবার নন্দকিশোরের পালা। ব্রজকিশোর তার কাজগুলো ঠিকই প্ল্যান মতই করে চলেছে বিনা বাধায়।

ব্রজকিশোর যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। এবার প্রিয়া একা। বাবা-মাও চলে গেছেন। তার বিষয় সম্পদের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। নন্দবাবুও ভাবেননি যে তাকে অসময়ে হঠাৎ এইভাবে চলে যেতে হবে। তাই কারখানা বিষয়-আশয়ের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থাই করে যেতে পারেননি এটাও ব্রজকিশোর জানে। তাই এবার ব্রজও ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য এগিয়ে আসে।

ললিতাও জানে এখন কি করতে হবে। তাদের একমাত্র সন্তান প্রাণকিশোরকে তারা পাঠিয়েছে বাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। তাই এবার ললিতা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে এবার নন্দকিশোরের প্রাসাদেই এসে ওঠে। বলে প্রিয়াকে,

— এত বড় বাড়িতে তোকে একা রেখে থাকতে পারবো না মা। বাবা মা না থাক্ আমরা তো আছি। তোর কোন অসুবিধা হতে দেব না।

তারপর ললিতাই ব্রজকে বলে,

— বিষয়-আশয়— কারখানা সব প্রিয়ার। ওর কারখানা সব কিছু তুমি দেখাশোনা করো, যেন কিছু তছনছ না হয়।

ব্রজ বলে — আমার নিজের ব্যবসাপত্রও রয়েছে। সে সবতো দেখতে হবে।

— প্রিয়াও ভাবনায় পড়ে।

— তাহলে এসবের কি হবে কাকাবাবু। আমি তো কিছুই বুঝি না। বাবা কি করে রেখেছেন। তাছাড়া আমারও পড়াশোনা রয়েছে।

— প্রিয়া এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। তারও ইচ্ছা সে আরও পড়াশোনা করবে। ললিতাও এই কথাই শুনতে চেয়েছিল প্রিয়ার কাছ থেকে। প্রিয়া বোঝে যে কাকাবাবু কাকীমাকেও তার দরকার। আর সেই কথাটা জানাতে ললিতা বলে ব্রজকে,

— তোমার ব্যবসা যা করছ করো। দাদার এতবড় ব্যবসাও দেখাশোনা করতে হবে তোমাকে। তারপর পড়া শেষ হলে প্রিয়াকে তার বিষয় বুঝিয়ে দিও। এটুকু কর্তব্য যত কঠিনই হোক না কেন করতেই হবে তোমাকে। ব্রজ তৈরিই ছিল। প্রিয়াও কাকীমার কথার রেশ ধরে বলে,

— তাই করুন কাকাবাবু। আমি নিশ্চিন্ত হবো। ব্রজ আমতা আমতা করে,

— কি আর করা যাবে। দেখছি। উঃ যা চাপ বাড়বে দম ফেলতেও পারবো না। তবে কি আর করা যাবে। তবে হ্যাঁ — প্রিয়া মা, মন দিয়ে পড়াশোনাটা করো কলেজে। আমি এসব সামলে নেব।

প্রিয়া বলে,

— ওর জন্য ভাববেন না কাকাবাবু। কলেজের পড়াশোনা ঠিক মতই করছি।

ব্রজ বলে — হ্যাঁ। তবে ওই খেলাধূলা — হৈ চৈ সাইকেল চড়া এসব একটু কমাতে হবে। সাইকেলে কেন কলেজে যাবে?

প্রিয়া এমনিতে ধনীর একমাত্র মেয়ে। একটু জেদী আর ডাকাবুকো। নন্দকিশোর বাবুও চেয়েছিলেন মেয়ে যেন খেলাধূলা করে। শুধু পড়াশোনাই নয়। তাই খেলাধূলাতেও প্রিয়া বেশ নামও করেছে। বিশেষ করে সাইকেল তার খুবই প্রিয় বাহন। নন্দবাবু বিদেশ থেকে তার জন্য দামী সাইকেলও এনে দিয়েছিলেন।

প্রিয়া স্কুল থেকেই সাইকেল রেসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এখন কলেজেও সে সাইকেল রেসে নাম করেছে। তার স্বপ্ন সেই ইউনিভার্সিটিই নয় — সাইকেল রেসে মহিলা বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্বই করবে সে।

এবার বাবা মারা যাবার পর বেশ কিছুদিন প্রাকটিস করতে পারেনি। বাবার মৃত্যুর আঘাতটা ক্রমশঃ সয়ে যায় প্রিয়ার।

আবার তার প্রাত্যহিক কঠিন পর্বও শুরু হয়। সকালেই সে বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বের হয়। ওদিকের একটা পার্কে তখন কিছু ভ্রমণার্থীর ভিড় মাত্র। প্রিয়া আরও দু'একজন মেয়ে সাইকেল চালিয়ে প্রাকটিস করে ওখানে। ঘন্টা খানেক সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফেরে প্রিয়া। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে

পড়াশোনা করে বের হয় কলেজে। গাড়ির অভাব নেই বাড়িতে। কিন্তু প্রিয়া সাইকেল চালিয়েই যাবে কলেজে।

কলেজ বাড়ি থেকে বেশী দূর না হলেও খুব একটা কাছে নয়। কিন্তু এই দূরত্বও গায়ে লাগে না প্রিয়ার। প্রিয়া কাকার কথায় বলে,

— সাইকেলে চড়ার অভ্যাসটা রাখতে হবে কাকাবাবু। সামনে আবার কলেজ স্পোর্টস। তারপর ইউনিভার্সিটি মিট। এবার বেঙ্গল মিটেও ট্রাই করবো।

ললিতা বলে,

— ও যখন বলছে তখন বাধা দিওনা বাপু। ওর সখ —

ব্রজকিশোর জানে ক্রমশঃ প্রিয়াকে দাবিয়ে রাখতে হবে তাকে। তাই একটা মানসিক চাপেই রাখতে চায় ওকে। অর্থাৎ প্রিয়াকে জানিয়ে দিতে হবে যে সে কাকাবাবুর দয়াতেই এই ভাবে রয়েছে।

ব্রজ বলে — না-না। ব্যাপার কি জানো, এর মধ্যে সমাজে কথাও উঠেছে যে আমি নাকি প্রিয়াকে গাড়ি ব্যবহার করতে দিই না। তাই ওকে সাইকেলে করেই এতটা পথ যেতে হয়।

প্রিয়া বলে — ও কাকাবাবু, কে কি বললো তাতে আমি কান দিই না।

প্রিয়া তবু সাইকেল ছাড়েনি। সকালের প্রাকটিসও বন্ধ করেনি। কলেজেও আসে সাইকেলে। অবশ্য এই বাড়িতেই এখন ব্রজকিশোর ললিতাকে নিয়ে এসে রয়েছে। শুধু ললিতাই নয়, ললিতার এক দূর সম্পর্কের ভাইপো ভোম্বলও এসে রয়েছে।

ভোম্বল ওর ডাকনাম। ভালো নাম একটা আছে সেটা স্কুল কলেজের খাতাতেই রয়েছে। প্রবীর কুমার তবে ভোম্বলের এই নামটাই খুব পছন্দ। বেশ গোলগাল নধর চেহারা। মুখের তুলনায় চোখ দুটো পিটপিট করে। বেশ ছোটই। তবে ভোম্বলের চাহনিতে বোকামির একটা ভাব ফুটে উঠলেও তার স্বভাবটা বেশ জটিল। তার স্বপ্নও অনেক।

দূর মফঃস্বলের একটা ছোট শহর থেকে এসেছে ভোম্বল। ওর বাবার সেখানে বাজারে একটা ছোট দোকান আছে। ব্রজকিশোর এই কারখানার-এই সাম্রাজ্যের ভোগ-দখল নিতে এবার তার মাথাতেই একটা মতলব এসে যায়।

প্রিয়া আইনত এ সব কিছুর মালিক আর প্রিয়াকে লোক দেখান বিয়ে থাও দিতে হবে। যদি সত্যি কোন ছেলেকে বিয়ে করে প্রিয়া। তখন সেই ছেলে ব্রজকিশোরের কথা নাও মেনে চলতে পারে। সে তার সব কিছু নিজের মত করে চালাতে চাইলে ব্রজকিশোরই বিপদে পড়বে সব থেকে বেশী।

তাই ব্রজ আগে থেকেই ওই ভোম্বলকে এনে সেট করতে চায়। ভোম্বল তার হাতের পুতুল হয়েই চলবে। সামান্য কিছু দিয়েই তাকে থামিয়ে রাখা যাবে। তাই ব্রজকিশোর ভেবে চিন্তে, ললিতাকে কথাটা বলতে ললিতাও খুশী হয়। বলে সে,

— দারুণ মতলব করেছ তো! ভোম্বলকেই আনাই।

— হ্যাঁ!

তবু ললিতার মনে ভয় জাগে। বলে সে,

— তোমার ভাইঝি ওই প্রিয়াও কম ধড়িবাজ মেয়ে নয়। যা জেদী। যদি ভোম্বলকে মেনে না নেয়?

ব্রজ বলে,

— সেই কাজটাই কৌশলে করতে হবে তোমাকে। ছেলেটা আগে আসুক। থিতু হোক। তারপর দেখবে ভোম্বলই সব ম্যানেজ করে নেবে। হাজার হোক, এই বয়সে কাছাকাছি থাকলে ইয়ে মানে ঘি আর আগুন তো! একটা কিছু হয়ে যাবে।

ভোম্বলও মফঃস্বল শহরে বার দুয়েক চেষ্টার পর কোনমতে টুকে তৃতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। অবশ্য পড়ার দিকে তার নজর ছিল না। খেলাধূলা করতো আর ইদানীং কাধের উপর কাকের বাসার মত ঘন চুল রেখে কোন জনপ্রিয় নায়কের ড্যামি হয়ে নাটক করতো। আর ফিল্মের নায়ক হবার স্বপ্ন দেখতো ওই সুদূর ধানমাঠে ঘেরা গ্রামে বসে। বাবা চিৎকার করে, — হতভাগা 'নট' হবে! ওসব ছেড়ে দোকানে বস। পড়াশোনা ঢের হয়েছে। তবু দু-পয়সা রোজগারের ধান্দা কর।

ভোম্বলের ওদিকে নজর নেই। সে তখন তারকা খচিত আকাশে ঘুরছে। এমনি দিনে কলকাতা থেকে ললিতা পিসীর ডাক শুনে এবার ভোম্বল যেন হাতে চাঁদ পায়। বলে সে,

— দ্যাখো, কলকাতায় যাচ্ছি। ঠিক বরাত ফিরবেই।

বাবা বলে — মন দিয়ে পড়াশোনা করবি আর পিসীমা পিসেমশাই-এর কথা মত চলার চেষ্টা করবি। দ্যাখ্ — যদি একটা হিল্যে হয়।

ভোম্বলও এখানে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে আর প্রিয়া একই কলেজে ভর্তি হয়েছে।

বিজয়ও কাছাকাছি এই কলেজেই ভর্তি হয়েছে। সমরজিতও চান বিজয় ভালো ভাবে পড়াশোনা করুক। ও বুদ্ধিমান, মেধাবী, ভদ্র। অথচ প্রতিবাদী চরিত্রের। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এখনকার যুব সমাজও ভুলে গেছে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। অন্যের কথা, সুস্থ সমাজ-জীবনের কথা আজকের তরুণরা ভাবে না। তাদের মানসিকতাই কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে। সমরজিতও কথাটা ভাবেন।

একটা অদৃশ্য কালো হাত যেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তরুণ মনকে, এই বিকৃতিকে নানা ভাবে জাগিয়ে তুলেছে। তারা প্রতিবাদও করে না। ফলে সমাজের প্রতিবাদী রূপটাই আজ হারিয়ে গেছে। তাই সেই অদৃশ্য প্রভু শ্রেণী সমাজের বুকে তাদের স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

সমরজিৎ বলেন,

— বিজয়, এই প্রতিবাদ যেদিন তরুণ সমাজ থেকে উঠবে সেদিনই দেশের, সমাজের রূপ বদলাবে। চিরকাল তরুণরাই বিদ্রোহ করেছে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এখন তরুণের বিদ্রোহী সত্বাটাকে সেই অদৃশ্য শক্তি মুছে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে।

বিজয়ও এটাকে দেখেছে। সে বলে,

— কিন্তু তরুণদের চিরকাল এইভাবে ভুলিয়ে রাখা যাবে না স্যার। তারা একদিন এই খেলাটাও ধরে ফেলবে। সমর বলে,

— ততদিন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যাবে বিজয়। তাই এই বিদ্রোহের অগ্নিশিখা সামান্য হোক—ছোট হোক, তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

বিজয় কলেজে আসে। তার পরণে দামী স্যুট, আর সাইকেল খানাও বিদেশী। দারুণ সাইকেল। বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা কলেজ। পুরানো আমলের গাছ-গাছালি বেশ কিছু রয়েছে সবুজ মাঠটাকে ঘিরে। বিজয় সবে দু'একদিন কলেজে এসে কিছুটা আঁচ পেয়েছে যে এখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বড়-

মাঝারি-ছোট মাপের নেতাও রয়েছে। আর আছে কিছু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়ে, তারা পড়ার জন্যই আসে।

কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ কিছু বড়লোক বাপের গোঁয়ার গোবিন্দ বখাটে ছেলে মেয়েরা আসে। তারা কলেজে আসে পড়ার চেয়ে বেশী সর্দারী-লীডারী করতে। অন্যদের দাবিয়ে রেখে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে দেখাতে।

আকাশ সেন তাদেরই একজন। কলেজে আসে একটা দামী গাড়ি হাঁকিয়ে। অবশ্য একা আসে না সে ওই গাড়িতে। তার সঙ্গে সবসময় চার পাঁচজন চ্যালা-চামচা থাকে। তারাও কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ক্রমশঃ দেখেছে তারা আকাশকে। ওর বাবার বিরাট এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট-এর ব্যবসা, শেয়ার বাজারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আকাশের বাবা।

আকাশের দামী গাড়ি থেকে ওরা নামে। মুখে আকাশের বাপের পয়সায় কেনা বিদেশী সিগারেট। ওদিকে এসে পড়েছে যমুনাও। সেও বড়লোকের মেয়ে। ইদানীং সেই-ই নাকি কলেজের স্পোর্টস সেক্রেটারী। নিজেও খেলাধূলা করে। সাইকেল রেসই তার প্রধান আইটেম।

আকাশের দলেই ভিড়েছে এখন ভোম্বল। সে গ্রাম থেকে এলেও কাজ গোছাবার হিসাবটা ভালোই জানে। দেখেছে আকাশের দলে ভিড়লে ক্যানটিনে ওর পয়সায় চপ-কাটলেট কফিও জোটে। আর জোটে বিদেশী সিগারেটও। ভোম্বল বলে,

— আকাশ, যমুনাকে এবার কলেজ স্পোর্টস-এ সাইকেল রেসে জয়ী করতে পারলে যমুনা নির্ঘাৎ বেঙ্গল মিটে চান্স পাবে।

যমুনা বলে — তা তো পাবো। কিন্তু আকাশ, শুনেছি প্রিয়াও জোর কদমে প্রাকটিস করছে। ও যদি এভাবে প্রাকটিস চালিয়ে যায়, ওকে পারা যাবে না রে। আকাশ যমুনার বিশেষ ভক্ত। যমুনার রূপ যৌবন অর্থ সবই আছে। আর যমুনাও আকাশের পরিচয় জানে। তাই ওদের মাখামাখিটা একটু বেশীই। আকাশ বলে,

— কি রে ভোম্বল, প্রিয়া তো তোদেরই বাড়িতেই থাকে। ওর ওপর একটু নজর রাখ। সব রিপোর্ট দিবি। ও কেমন প্রাকটিস করছে নজর রাখবি।

যমুনাও ভোম্বলের কাছে এসে ওর গায়ে ঢলে পড়ে বলে,

— একটু হেল্প কর ভোম্বল।

আকাশই অভয় দেয় — ও ঠিক যা বলবো, করবে।

আকাশের আর এক চ্যালা ভূপেন বলে,

— আকাশ এবার তুই-ই বেঙ্গল মিটে যাবি। ফোর হানড্রেড এইট হানড্রেড মিটারে তোকে হারানোর মতো কলেজে কেউ নেই রে।

ভোম্বলও বলে — সিওর। আকাশই এবার স্পোর্টসে গ্রেট হিরো - আর হিরোইন ওই যমুনা বোস।

বিজয় ওদের পাশ দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে। শোনে সে ওদের কথা। সেও এবার স্পোর্টস-এ নাম দিয়েছে। অবশ্য তাকে এরা এখনও ঠিকমত চেনেনি। ওর দিকে আকাশ যমুনাদের কোন নজরই নেই। বিজয় কলেজের শেডে সাইকেলটা রেখে তালা দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে প্রিয়াকে। প্রিয়াও সাইকেলে এসেছে। সে বিজয়ের সাইকেলটা দেখে চাইল। সাইকেলটা বিদেশী। জার্মানীর কোন নামী কোম্পানীর সাইকেল আর ওর গিয়ারটা বিশেষভাবে তৈরী। প্রিয়া শুধায়,

— তোমার সাইকেল?

বিজয় চাইল ওর দিকে। বিজয়ের সাইকেল ওটা নয়, সমরজিৎ তাকে ওটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বিজয় বলে,

— আমার বাড়িওয়ালার। তিনিই ওটা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

প্রিয়া বলে — দারুণ সাইকেল। এসব জিনিস এদেশে মেলে না। আমার সাইকেলটাও বিদেশী। তবে এত মর্ডান নয়। কেমন স্পীড ওঠে?

বিজয় বলে,

— তুলতে পারলে ভালোই ওঠে।

প্রিয়া বলে — চেষ্টা করে দেখতে হবে। তুমি থাকো কোথায়?

বিজয় ওর ঠিকানা জানাতে প্রিয়া বলে,

— আমাদের ওদিকেই। আমি থাকি ওদিকেই।

কলেজের ঘন্টা বাজছে। বিজয় বলে,

— ক্লাশ শুরু হবে।

ওরা এগিয়ে যায় কলেজের ক্লাশরুমের দিকে। লম্বা প্রশস্থ করিডর। হঠাৎ ওদিকে ছাত্রদের চীৎকার-গোলমাল শুনে চাইল ওরা।

দেখা যায় ওদিকে আকাশ তার দলবল মায় যমুনা আর তাদের দলের কিছু ছেলে মেয়ে ক্লাশের দরজা আটকে শ্লোগান দিয়ে চলেছে। কমনরুমের সামান্য দাবী নিয়ে ওরা দু'একবার কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলেছিল। কিন্তু সেটা এখনও হয়ে ওঠেনি, তাই আকাশের দল আজ মিটিং করে কলেজের কাজই অচল করে দিতে চায়। তাই নিয়ে ওরা ক্লাশও বয়কট করে আন্দোলন শুরু করেছে।

ওদিকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীরাও দাঁড়িয়ে আছে। তারা তুচ্ছ কারণ নিয়ে এই আন্দোলন চায় না। তারা চায় ক্লাশ হোক। প্রাকটিক্যাল ক্লাশও হোক যথারীতি। দু'একজন বলে,

— এসব আন্দোলনের কোন দরকার নেই। কমনরুমের সমস্যা সমাধান করে দেবেন ওরা সাতদিনের মধ্যে। তবে এসব কেন?

যমুনা ফুঁসে ওঠে—এতদিন কেন কাজ হয়নি?

ভোম্বলও এবার প্রিয়ার সামনে তার প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেবার জন্যই হাত তুলে চীৎকার করে,

— আমাদের দাবী মানতে হবে।

আকাশের চর-অনুচররাও চীৎকার করে, — মানতে হবে - মানতে হবে।

আকাশ তখন ওই আন্দোলনের নেতা সেজে হাত ছুঁড়ছে। বিজয় এতক্ষণ দেখছিল। তার মনে পড়ে সমরবাবুর কথা। 'আজকের তরুণরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আর সাহস পায় না'। বিজয় দেখছে বহু ছেলে মেয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে না। কিন্তু তারাও যেন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আন্দোলনকে দেখছে।

এর প্রতিবাদ বিজয়ই করে। বিজয় এবার এগিয়ে এসে সতেজ স্বরে বলে, —এই অন্যায় আন্দোলনকে মানি না। এই আন্দোলন থামাও।

আকাশের কোন চ্যালা আওয়াজ দেয়,—কে র‍্যা!

বিজয় এগিয়ে আসে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে,—আমি। আমি বলছি এই আন্দোলন থামাও। আমরা ক্লাশে যাবো।

আকাশ দেখছে বিজয়কে। ভোম্বল-ভূপেনরাও অবাক হয় ওই ছেলেটার সাহসে। এর মধ্যে বেশ কিছু ছেলে মেয়েও বিজয়কে সমর্থন করে। তারা বলে সমস্বরে—আমরাও এ আন্দোলনে নেই। এ অন্যায় জুলুম।

আকাশ-যমুনারা দেখছে, ওই একটি ছেলে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে এবার কয়েকশ ছেলে মেয়ে তার দলে ভিড়েছে। প্রিয়াও আকাশদের দলকে সহ্য করতে পারে না।

দেখেছে যমুনাও তাকে অবজ্ঞাই করে। আকাশ অবশ্য প্রথমে প্রিয়ার দিকে নজর দিয়েছিল। কিন্তু দেখেছে ওই মেয়েটা তার দলে ভেড়েনি। তাকে রেস্তোরা-সিনেমার লোভ দেখিয়েও দলে আনতে পারেনি আকাশ। তারপর যমুনা এসে পড়তে আকাশ এখন তারই গুনমুগ্ধ। অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রিয়াও এগিয়ে আসে, —এই আন্দোলন মানি না। ক্লাশে চলো সবাই।

— তাই চলো।

ছেলেমেয়ের দল এবার বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের মত ওদের বাধা তুচ্ছ করে ক্লাশে গিয়ে ঢোকে বিজয় আর প্রিয়ার নেতৃত্বে।

কলেজের করিডর প্রায় শূন্য। ওই ক্লাশের ছেলে মেয়েদের অনেকেই ক্লাশে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আকাশ-যমুনা আর ভোম্বলদের মত আকাশের কিছু অনুচর। ওদের সামনে বিজয-প্রিয়া যেন আকাশের এতদিনের প্রতিষ্ঠাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আকাশ বলে, — ওদের উচিত শিক্ষাই দেব। আমাকে টপকে যাবে! ভোম্বল বলে — প্রিয়া হঠাৎ ওই ছেলেটার দলে ভিড়ে গেল রে!

আকাশ বলে—তুই শালা একটা অকম্মার ধাড়ি রে ভোম্বল। গুড ফর নাথিং। একটা মেয়েকে কনট্রোল করতে পারিস না।

ভোম্বলও এবার রীতিমত অপমানিত বোধ করে। এবার তাকেও চেষ্টা করতেই হবে প্রিয়াকে হাতে আনার জন্য।

যমুনা বলে, — ক্লাশে আজ যাবো না। চল, সামনে স্পোর্টস। মাঠে প্রাকটিস করা যাক। যা ভাবগতিক দেখছি, ছাত্র ইউনিয়নের ভোটেও এবার কাৎ না হয়ে যাস তোরা। তবু স্পোর্টস-এ নামটা বজায় রাখতে পারলে মুখ থাকবে।

আকাশও ভাবনাতে পড়ে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবগতিক কেমন যেন বদলাচ্ছে। এবার নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে হবে। দরকার হলে অনেক কলা কৌশল করেই প্রতিপক্ষকে হারাতে হবে। ভূপেন বলে, — তাই করতে হবে বস। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন

লাভ এন্ড ওয়ার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর প্রেমের ক্ষেত্রে যে ভাবে হোক জিততে হবে। সেখানে সততার কোন ঠাঁই নেই। আকাশও সায় দেয়—কারেক্ট! এবার তাই তৈরী হতে হবে। আজকের অপমানের জবাব ওদের দিতেই হবে। ওই বিজয় আর প্রিয়াকে। ওদের দলবলকে।

ললিতা এখন এই সংসারের কর্ত্রী। সে সংসার ধরে রেখেছে আর ব্রজকিশোরকে সে মতলব দেয়, — ওই কারখানা - অফিস - ব্যবসাপত্র সব গ্রাস করতে হবে। মেয়েটাকে যেভাবে পারো ধাপ্পা দিয়ে চলো। অবশ্য এই কথা ব্রজকিশোরকে শেখাতে হবে না। ব্রজও জানে কিভাবে পা ফেলতে হয়। সে তার হিসাব মত কাজ করে অনেকের জায়গা-জমিই দখল করে বিরাট ম্যানসন-টাওয়ার-বাজার এসব তৈরী করে বিক্রী করে কোটি টাকা কামিয়েছে। অথচ কেউ তাব গায়েও হাত দিতে পারেনি।

সে এবার মনোনিবেশ করেছে নন্দকিশোরের নিজের এতদিনের পরিশ্রমে আর নরনারায়ণের টাকায় গড়া এই কারখানার দখল নিতে। ব্রজকিশোর দেখেছে এখানে নন্দকিশোরের আমলের বেশ কিছু বিশ্বস্ত-সৎ কর্মচারী আছে। তাদের জোরেই এই কারখানা এত লাভজনক হয়ে উঠেছে। তারা রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে। ব্রজকিশোর ওদের চটাতে সাহস পায় না। ওদের সামনে ব্রজকিশোরও কাজের লোক — পুরোপুরি সৎ লোক হবার ভানই করে। বলে,

— দাদার কারখানা, এর সবকিছু প্রিয়ার। মিঃ রায় - মিঃ সেন আমাদেরও এর কিছু দায়িত্ব আছে। আমি চাই দাদার আমলে যে ভাবে কারখানা চলছিল, সেইভাবেই চালাবেন আপনারা। আমিও আপনাদের পরামর্শ মতই কাজ করবো।

কর্মচারীরাও খুশী হয় ব্রজের কথায়। ব্রজকিশোর শুধু দেখছে কি ভাবে পা ফেলবে। সেটা এই দেখে শুনেই ঠিক করবে ব্রজ।

অবশ্য এরমধ্যে ব্রজবাবুই জেনেছে দাদার একজন পার্টনারের খবর। উনি সেই গ্রামের জমিদার নরনারায়ণবাবু। ব্রজ ওই কাগজপত্রও দেখেছে। দাদার নিজস্ব আলমারীতে। সেই পার্টনারশীপ দলিলের খবর পুরানো কর্মচারীরাও জানে না। ব্রজবাবুও সেই গ্রামেও খোঁজ খবর নিয়ে খুশী হয়।

নরনারায়ণবাবু মারা গেছেন আগেই। তারপর তার ছেলে বাড়ি জমি বিক্রী করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তার কোন খবর গ্রামের লোকও কেউ আর জানে না। অর্থাৎ সেই নরনারায়ণের ছেলেও নিশ্চয়ই বাবার এই দলিলের খবর জানে না। জানলে এর মধ্যে নিশ্চয়ই আসতো এখানে তার সম্পত্তির দখল নিতে। পাক বা না পাক সে আসতোই। যখন আসেনি, তখন সেই ছেলেও তার বাবার এই সোনার খনির কোন খবর আদৌ জানে না।

ব্রজকিশোর সেই হিসাব করেই অফিসের মধ্যে রাখা নন্দবাবুর ব্যক্তিগত আলমারী থেকে ওই দামী দলিলটা বের করে বাড়িতে নিজের ঘরে এনে আলমারীতে সযত্নে রেখে দিয়েছে। তারপর ভাবছে এবার দাদার সর্বস্ব প্রিয়াকে ফাঁকি দিয়ে কি ভাবে গ্রাস করা যায়।

ভোম্বল এবার একটু সতর্ক হয়ে উঠেছে। প্রিয়ার ওই ব্যবহারটা তার মোটেই ভালো লাগেনি। সে এসে ললিতাকেই বলে,

—প্রিয়া কলেজে আজে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে। আর সাইকেল নিয়ে কলেজে যায় কেন জানো পিসীমা —

ললিতা চায় প্রিয়া তাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকুক। তাই অন্য ছেলের সঙ্গে মেশামেশির খবরে ললিতা বলে,

— সে কি রে! বলেছিলাম তুই ওকে গাড়িতে করে কলেজে নিয়ে যাবি। আবার ফিরিয়ে আনবি!

ভোম্বল বলে,

— তাহলে ওই সব ঢলাঢলি চলবে? চলবে না। আমি তো সব দিকে নজর রাখবো, তাই উনি ওই সাইকেলে চেপে রাসলীলা করতে যান! কলেজে ওই গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে মিশে আমাদের ইয়ে, মানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শেষ করে দিল।

ললিতা বলে — তোর পিসেমশাইকে বলছি। সত্যি মেয়েটা বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করা দরকার।

ব্রজকিশোর সাবধানী হিসাবী মানুষ। সে প্রিয়ার সম্বন্ধে ছকটা ভেবে রেখেছে। কোনমতে ভোম্বলের মত একটা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে ভোম্বলকে দিয়েই

ওই কলকারখানা বাড়ি সব লিখিয়ে নেবে। তারপর দুটোকেই সেই অজ পাড়াগাঁয় পাচার করে দিয়ে নিজেই সর্বস্ব দখল করবে। তাই বলে,

— ভোম্বল, কাল থেকে প্রিয়া সাইকেল আর পাবে না। গাড়িতেই যাবে কলেজে। তুইও একটু ইয়ে মানে চেষ্টা কর। ইয়ং ম্যান তুই! একটা ইয়ে মানে মেয়েকে হাতে আনতে পারিস না!

ভোম্বলও এবার ভাবছে কথাটা। ওর চোখের সামনে বহু সিনেমা-টিভি-সিরিয়ালের পর্দায় দেখানো জমাট সিন ফুটে ওঠে। কোন দৃশ্য সঠিক ডায়ালগ বলবে প্রিয়াকে তাই ভাবছে। বলে সে,

— এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।

হ্যাঁ। একটু চোখে চোখে রাখবি, যেন যার তার সঙ্গে মেলামেশা না করে। তাতে তোরই ক্ষতি। আর নিজের ভালোমন্দ পাগলেও বোঝে। তুই বুঝতে পারিস না! কাল থেকেই কাজে নেমে যা।

ভোম্বলও অভয় পেয়ে এবার খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে। এতদিন তবু একটু বাধো বাধো ঠেকতো প্রিয়ার কাছে। এবার সেও একেবারে ফ্রি হতে পারবে।

প্রিয়া কিছুদিন থেকেই দেখেছে, এবার কাকা-কাকীমা যেন একটু করে বদলাচ্ছে। এতদিন প্রিয়ার হাতখরচা দিয়ে যেতো অফিস থেকে ক্যাসিয়ারবাবু নিজে এসে। মাসে হাজার তিনেক টাকা দিয়ে যেতেন তিনি। তাছাড়া মার্কেটিং-এর জন্য টাকার দরকার। ফোন করলেই টাকা এসে যেতো। সেদিন কাকীমা খাবার টেবিলে বসে বলে, — প্রিয়া মা, টাকা আছে বলেই কি খরচা করতে হবে? থাকলে তো তোরই থাকবে। খরচা একটু কমা। এত টাকা কিসে লাগে?

প্রিয়া চুপ করে থাকে। সে ভাবতে পারেনি যে কাকীমা তার হাত খরচা নিয়েই কথা বলবে। প্রিয়ার বাড়তি টাকা কিছু লাগে। কলেজের দু-চারজন গরীব বন্ধুদের সে গোপনে সাহায্য করে। অনেককেই বইপত্রও কিনে দেয়। ব্রজ বলে, — হ্যাঁ, ক'মাস ধরে টাকা একটু বেশীই নিচ্ছ। শোন, এবার থেকে আমিই তোমাকে মাসে হাজার দেড়েক করে হাত খরচা দেব। অফিসের থেকে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না।

প্রিয়া বলে,

— এতদিন ধরে বাবার আমল থেকেই বাবা এইভাবে এই টাকা দিয়েছেন।

এবার ব্রজকিশোর বলে,

— ইয়ে মানে, কোম্পানীর ব্যবসাপত্র এখন মন্দা চলছে। বাজারের অবস্থাও ভালো নয়। তাই খরচা কমাবার দরকার। অবশ্য কোনাকাটার জন্য দরকার হয় কাকীমাকে বলো, কাকীমা দু'এক হাজার টাকা দেবে।

অর্থাৎ অফিস থেকে নয়, এবার ওদের কাছে হাত খরচার জন্য হাত পাততে হবে। অবশ্য প্রিয়ার টাকার অভাব নেই। প্রিয়ার বাবা প্রিয়ার নামেই ভালো টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। তার সুদও কম নয়। সেটা অবশ্য ওই ব্রজকিশোরদের বলেনি প্রিয়া। ওদের এই গায়ে পড়ে বসে উপকার করাটা প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি প্রিয়ার। এখন ক্রমশঃ প্রিয়া বুঝেছে তাকে ওরা জালে ফেলে বিশেষ ভাবে চাপ দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চায়।

এর কয়েকদিন পরই সকালে উঠে প্রিয়া তার সাইকেল নিয়ে বের হতে যাবে, দেখে সাইকেলটা সেখানে নেই। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে সেও কিছু বলতে পারে না। এ বাড়ির লোকজন একটু বেলাতেই ওঠে। অবশ্য ভোম্বল নজর রেখেছিল প্রিয়ার উপর। কারণ সাইকেল অপসারণের ব্যাপারটায় তার ভূমিকাও কিছু ছিল। ভোম্বল বাগানেই ছিল। সেই-ই বলে,

— পিসেমশাই-এর হুকুম, আর সাইকেলে চাপা চলবে না। এবার গাড়িতেই বের হতে হবে। নো সাইকেল। তাই ওটা আর নেই।

প্রিয়া কথাটা শুনে চমকে ওঠে! তার নিজস্ব ইচ্ছাগুলোকেও এবার কাকাবাবু শেষ করে দিতে চায়। সামনে সাইকেল রেস। এসময় সাইকেল কেড়ে নিলে বিপদেই পড়বে প্রিয়া। কিন্তু সে দমবার পাত্রী নয়। সাইকেল তাকে পেতেই হবে। যে কোন সাইকেল হোক। কদিন তাতেই চালিয়ে নিয়ে নিজেই সাইকেল কিনবে।

ভোম্বল হুকুমটা শুনিয়ে চলে গেছে! হঠাৎ প্রিয়ার চোখে পড়ে, ফটিক এসেছে কাগজ দিতে। ফটিক তাদের এতদিন ধরে খবরের কাগজ-পত্র পত্রিকা দিয়ে এসেছে। ও ভোর থেকেই কাগজ বিলি করতে বের হয়। কাগজ সব বিলি করে শেষকালে এখানে আসে। এখানে কাগজ দিয়ে আউট হাউসে

দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করে চা বিড়ি খেয়ে ঘন্টা খানেক কাটিয়ে চলে যায়। তার সাইকেলটা নতুন কিনেছে। প্রিয়া বলে, — ফটিক, তুমি দারোয়ানজীর ওখানে চা-টা খাও। তোমার সাইকেল নিয়ে একটু ঘুরে আসি। কদিন এই সময়ে আসবে। আমি বের হবো।

ফটিক বলে,

— এতো ভারি সাইকেল দিদিমণি, আপনাদের মত দামী বিলাতী সাইকেল নয়। চালাতে কষ্ট হবে।

— না-না। শোন, এটা রাখো। চা খাবে। এই বলে ওর হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে সাঁ করে বের হয়ে যায় প্রিয়া। ফটিক অবাক হয়ে দেখছে। অবশ্য পথের বাঁকে প্রিয়াকে আর দেখা যায় না। প্রিয়া তখন পার্কের দিকে চলেছে। তার সাইকেল প্রাকটিস সে ঠিকই চালিয়ে যাবে।

ভোম্বল অবশ্য প্রিয়ার এইভাবে প্রাকটিসের খবরটা জানতে পারেনি। প্রিয়া আর ফটিক দুজনেই খবরটা গোপন রেখেছে। অবশ্য ফটিকের এরজন্য রোজ কুড়ি টাকা করে আমদানী হয় ঘন্টা খানেকের মধ্যে। ব্যাপারটা ঘটে ভোর বেলায়। তখন ভোম্বল কেন, বাড়ির কর্তা ব্রজকিশোর, কর্ত্রী ললিতাও গভীর ঘুমে ডুবে থাকে। আর ভোম্বল তো ওঠে সবার শেষে — বেলা আটটায়।

বিজয়ও তৈরী হচ্ছে স্পোর্টস-এর জন্য। পড়াশোনাতেও সে এর মধ্যে কলেজে নাম করেছে। আর ওই আকাশের দলের অন্যায় জুলুম মায় র‍্যাগিং, নানারকম জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এখন কলেজে সাধারণ ছেলে মেয়েরাও ওর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছে। ওর দলেও জুটেছে অনেকে। আকাশরাও কলেজে তাদের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য চোখ খুলেই রাখে। তারাও এবার বিজয়ের দলের প্রতিষ্ঠা বাড়তে দেখে চিন্তায় পড়ে।

তাই আকাশরা চায় স্পোর্টসে তাদের দলকে যেভাবে হোক জিততেই হবে। যমুনাও আকাশের কাছের লোক। মেয়েদের মধ্যে যমুনাকেই আকাশ লীডার বানাতে চায়। কিন্তু আকাশ দেখেছে সেখানে বাধা হয়ে উঠেছে ওই প্রিয়া।

প্রিয়াও সেদিন বিজয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে আকাশদের ডাকা ছাত্রধর্মঘট

বানচাল করে দিয়েছিল। আর বিজয়ও প্রিয়ার এই সমর্থনে সেদিন আকাশদের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল। আকাশ ভোম্বলরাও পরিস্থিতি দেখে।

কলেজ কমনরুমে বিজয় প্রিয়া আর বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মিটিং শুরু করেছে। এবার ভোটে ছাত্র সমিতি দখল করবে বিজয়ের দল। প্রিয়ার সাহায্যও থাকবে। তারা আকাশদের হটাতে চায়।

ভোম্বল খবরটা শুনে চমকে ওঠে। সেই-ই আকাশদের এসে খবর দেয়.

— এবার আমাদেরই ওরা ভোটে হারিয়ে ছাত্রসমিতি দখল করতে চায়।

আকাশ বলে — দেখা যাবে। তবে ওই বিজয়টা কোন আদাড় গা থেকে হঠাৎ কলকাতায় এসে ডানা পালক গজিয়েছে। ওটাকে ছেটে ফেলতে হবে।

ভোম্বলও বিজয়ের উপর মোটেই খুশী নয়। সে ভেবেছিল প্রিয়া ভোম্বলের কথামতই চলবে। তার সঙ্গেই বেশী মেলা-মেশা করবে। কিন্তু ভোম্বল দেখেছে প্রিয়া অজানা ওই বিজয়টার দিকেই যেন বেশী ঢলছে।

ভোম্বলও বলে. — ব্যাটার সম্বন্ধে একটু খবর নিতে হবে বস্। বিজয়টা সত্যিই বেড়েছে।

বিজয়ও গ্রাম থেকে সব হারিয়ে হার মেনে এসেছে কলকাতায়। এখানে তাকে পায়ের তলে মাটি পেতেই হবে। আর ভাগ্যক্রমে বিজয় সমরজিতের মতো লোকের আশ্রয়ে এসে পড়ে। ক্রমশঃ নিজেকে নতুন করে গড়ার সুযোগ পায়। সমরজিৎ বলে,

— জীবনে হার মানবে না। লড়তে হবে। আর সেই লড়াই-এ জিততেও হবে।

বিজয় পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এবার স্পোর্টস্-এর জন্যও তৈরী হচ্ছে। কর্নেল সমরজিতও চান বিজয় সবদিক থেকে নিজেকে তৈরী করুক। তিনি এখনও ভোরে উঠে বাড়ির লাগোয়া মাঠে জগিং করেন ঐ খোঁড়া পায়ে। আর এখন তার ডিউটিও বেড়েছে। ভোরে বিজয়কেও তুলে দেন। সেও এখন দৌড়ায় ভোর বেলায়। কর্নেল নিজে টাইমিং দেখেন। আবার দৌড়ের স্টেপিং কিভাবে হবে তাও দেখিয়ে দেন। বিজয় নিজেকে শুধরে নিয়ে আবার দৌড় শুরু করে। পাঁচশো মিটার - হাজার মিটার দৌড়ের প্রাকটিস চলে। আবার লং জাম্প-এর প্রাকটিস। গলদঘর্ম হয়ে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়াশোনা, তারপর খেয়েদেয়ে কলেজ।

প্রিয়ার প্রাকটিসও চলেছে ভোরে। ফটিক এখন নিয়মিত আসে সাইকেল নিয়ে। আর প্রিয়াও তৈরী থাকে। ওর সাইকেল নিয়ে বের হবে।

সেদিন প্রিয়া বের হয়েছে। একটু দুরেই সে চলে এসেছে সাইকেল নিয়ে। হঠাৎ দেখে সামনে বিশাল খোলা মাঠে একজন বয়স্ক লোক আর বিজয় দৌড়াচ্ছে। প্রিয়াও অবাক হয়।

— বিজয়।

বিজয়কে ভালো করেই চেনে প্রিয়া। কলেজের সুপরিচিত ভালো ছাত্র। বিজয়ও প্রিয়াকে সাধারণ একটা সাইকেল নিয়ে এদিকে আসতে দেখে চাইল। অবশ্য বিজয় জানে না প্রিয়ার প্রকৃত পরিচয়।

বিজয় বলে — এদিকে?

বিজয় তার দৌড়ে থামিয়েছে আর সাইকেল থেকে নেমেছে প্রিয়া। দুজনে দুজনকে এখানে আবিষ্কার করে যেন খুশীই হয়েছে।

কর্নেলও জগিং করছিলেন। সকাল হচ্ছে। বাতাসে হিম হিম ভাব। গাছের গায়ে জড়ানো কুয়াশার চাদরটা ফিকে হয়ে আসছে। পাখীদের কলরব জাগে। ওদিকে লোয়ার কলোনীর লোকদের ঘুম সবে ভেঙেছে। মাঠে লোকজন বিশেষ নেই। বিজয় প্রিয়া কথা বলছে। সমরজিৎ এগিয়ে আসেন। বলেন,
— থামলে কেন বিজয়?

বিজয় এবার কর্নেলকে দেখে বলে,

— আংকেল এ প্রিয়াঙ্কা। একসঙ্গে কলেজে পড়ি। প্রিয়া ইনিই কর্নেল সমরজিৎ। আমার গার্জেন —

প্রিয়া ওই বয়স্ক মানুষটার মুখে চোখে কেমন আভিজাত্য ব্যক্তিত্ব আর বলিষ্ঠতার ছাপ দেখে মাথা নীচু করে প্রণাম করে ওকে।

— আরে করছ কি! থাক্ থাক্। আজকালকার ছেলে মেয়েরা তো প্রণাম করতেই ভুলে গেছে।

প্রিয়া বলে — মাথা নীচু করতে না শিখলে মাথা উঁচু করা যায় না।

— কারেক্ট! ঠিক কথা বলেছ। হ্যাঁ, কি যেন নাম বললে?

— প্রিয়া।

সমরজিৎ বলেন — প্রিয়া, বেশ মিষ্টি নাম। তোমার মতই। তা সকালে সাইকেল নিয়ে কোথায় চলেছ?

প্রিয়া বলে — কলেজে স্পোর্টস, আমি তো সাইকেল রেস করি। তাই একটু প্রাকটিস করছি।

— এই বাজে সাইকেলে প্রাকটিস হয় না। কর্নেল বলেন।

প্রিয়া বলে — তা সত্যি। তেমন সাইকেল তো নেই। তাই এই দিয়েই চালাতে হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ির ওদিকে তেমন মাঠও নেই। তাই ভোরে পথ ঘাট একটু ফাঁকা থাকে। তাই রাস্তাতেই প্রাকটিস করছি।

বিজয়ও বলে — খুবই প্রবলেম।

কর্নেল বলেন — বিজয়, তোমার রেসিং সাইকেল তো রয়েছে। প্রিয়া, এই মাঠে ভিড় থাকে না। তুমি ভোরে চলে এস এখানে। এখানেই প্রাকটিস করবে। চলো বাংলোতে কথা হবে।

প্রিয়া জানে ওদিকে তার সাইকেলের মালিক বসে রয়েছে। সে এড়াবার চেষ্টা করে।

— ওদিকে দেরি হয়ে যাবে।

বিজয় বলে — বেশী দেরী হবে না প্রিয়া। এতদূর এসে এক কাপ চা না খেয়ে গেলে আংকেল কি মনে করবেন।

প্রিয়া বিজয়ের সঙ্গে মাঠের ওদিকে সুন্দর ছোট বাগান ঘেরা বাংলোতে এগিয়ে যায়। বেশ কিছু ফুলের বাগান — কর্নেল ফুলও ভালোবাসেন, সবুজকেও। বাংলোটা ছোট দোতলা আর বেশ সুন্দরও। প্রিয়ার এই পরিবেশটাও ভালো লাগে। ড্রইংরুমে এসেছে ওরা। দেওয়ালে কাবার্ডে রয়েছে কর্নেলের যুদ্ধের অনেক স্মৃতি। কারগিল পাহাড় পর্বতের বরফ ঢাকা সেই সব ছবি। কর্নেল বলেন,

— প্রিয়া, তাহলে কাল থেকেই প্রাকটিসে লেগে যাও। বিজয় আর তুমি দুই জনকেই ট্রেনিং দিয়ে চ্যাম্পিয়ান বানাতে হবে।

আজ বিজয় প্রিয়াও স্বপ্ন দেখে এই লড়াই-এ হারবে না।

বেলা হয়ে গেছে। ভোম্বল বাড়ির বর্তমান কর্তা ব্রজকিশোরও সকালে উঠে বাগানে পায়চারী করছে।

প্রিয়াকে ফিরতে দেখে ব্রজ বলে,

সাত সকালে কোথায় গেছিলে প্রিয়া?

প্রিয়া ওদিকে গলির মোড়েই ফটিককে সাইকেল দিয়ে হেঁটেই ফিরছে এইটুকু পথ। প্রিয়া বলে,

— কাকাবাবু, সকালে পার্কে একটু বেড়াতে গেছিলাম। সকালে বের হলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে থাকে।

ব্রজ বলে — ও, তা ভালো।

প্রিয়া কথা বাড়ায় না। বাড়ির ভিতরে চলে যায়। ব্রজ বলে ভোম্বলকে,

— কি করিস তুই? সকালে উঠে ওর সঙ্গে একটু ইয়ে মানে মর্নিং ওয়াক করতেও তো পারিস। তা নয়, কেবল খাবি আর ঘুমাবি। শরীরটা একেবারে যে স্টীম রোলার হয়ে যাচ্ছে সে খবর রাখিস!

ললিতাও এসে পড়ে। সে বলে, — আহা! বেচারাকে আর খুঁটো না বাপু! কি এমন খায়। আর মোটা কেন হবে? এই বয়সে গায়ে একটু গাও লাগে। ও কিছু না। এসো চা দিয়েছি।

প্রিয়াকে কাকীমা খবর দিয়েছে চায়ের টেবিলে আসার জন্য। কাজের মেয়েকে প্রিয়া বলে,

— আমার কলেজের পড়া অনেক বাকী। আমি পড়তে বসছি। তুই এখানেই আমার চা পাঠিয়ে দে।

প্রিয়া জানে কাকীমার লেজুড় ভোম্বলও থাকবে ওখানে, কাকাবাবুও। কাকীমাও চায় প্রিয়া ভোম্বলকেই পছন্দ করুক। প্রিয়ার ক্ষমতা থাকলে সে ওটাকে দূর করে দিত। কিন্তু এখন সে অসহায়। কাকীমা কৌশলে এই সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে কর্ত্রী সেজে বসেছে। আর কাকাবাবুও তার বাবার অফিস-কারখানা দখল করেছে। এখন প্রিয়াকেই তাদের কাছে হাত পাততে হয়। তারই সর্বস্ব যে লুটেছে ওই কাকাবাবু-কাকীমা, এটা বোঝার মত জ্ঞান তার হয়েছে। তবে এই শোষণের প্রতিবাদ - প্রতিকার করার শক্তি তার নেই। তাই প্রিয়া ওদের পছন্দ করে না। সেটাও সে বুঝিয়ে দিতে চায়। একটা রেসিং সাইকেল তাকে কিনতেই হবে। কিন্তু তার নিরাপত্তার মিথ্যা ভান করে কাকাবাবু—ভোম্বল সেটাকেও না করিয়ে দেয়। তাই ভাবছে প্রিয়া।

এখন ভোর বেলাতেই বের হয়ে পড়ে প্রিয়া এ বাড়ির ঘুম ভাঙ্গার আগে। বিজয়ই সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসে ওদিকে পার্কের ধারে। ওরা দুজনে বের হয় কর্নেলের মাঠে। শুরু হয় ট্রেনিং। কর্নেল দুজনকে নিয়ে পড়েছেন।

ঘন্টাখানেক তার কঠোর অনুশীলনের পর ওর বাংলোতেই ব্রেকফাস্ট খেতে হয়। বিজয় খানিকটা পথ প্রিয়াকে এগিয়ে দেয়। প্রিয়াও ঠিক সময় বাড়ি ফেরে।

ছনু-কালু দুজনেই সেদিন পথে ওই ব্যাগ ছিনতাই করে কর্নেল সাহেবের নজরে পড়তে পড়তে কোনমতে মাল ফেলে পালিয়ে বেঁচেছিল। ওরা জানে কর্নেল সাহেব তাদের এইসব পুণ্যকর্ম্ম চোখে দেখলে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে পিছনে লাথি মেরে দূর করে দেবেন। তাই হাতের শিকার ফেলেই পালিয়েছিল।

তারপর অবশ্য কারখানায় ফিরে মুখ বুজে ভালো মানুষের মত কাজ শুরু করে। রাতে দুজনে একটু মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরদিন সকালেই কলে জল ধরতে গিয়ে ছনু বাংলোর বাগানে বড় সাহেবের সঙ্গে ওই বিজয়কে দেখে চমকে ওঠে। ওর মালই টেনেছিল। পার্টির মুখ একবার দেখলে তার মনে থাকে। আরও জানে ছনু ওই ছোকরাও তাদের এখানে দেখলেই চিনে ফেলবে। তাই কোনমতে জল নিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে কালু তখনও ঘুমাচ্ছে। আটটায় ডিউটিতে যেতে হবে। ছনু ওকে ডাকে,

— ওঠরে, এ্যাই কালু, উঠ — গজব হো গিয়া —

ওর ডাকাডাকিতে কালু চোখ মেলে।

— কি গজব হল রে? সাতসকালে হুজ্জুতি শুরু করলি —

এবার ছনু বলে ব্যাপারটা। সেই মাল বড়সাহেবের রিস্তাদার। বড়-বাংলোতেই রয়েছে। এখন তাদের চিনতেও পারবে। তারপর যদি সাহেবকে বলে দেয়, তখন? কালুর এবার ঘুম চলে যায়। বলে সে,

— তাই নাকি রে!

— দ্যাখ উধার। দেখায় ওকে ছনু। দেখে জানলা থেকে সেই ছোকরা আর কর্নেল সাহেব চা খাচ্ছে। কালু বলে, — তাই তো রে! এখন সরে সরে থাক্। যেন দেখতে না পায়।

— তারপর?

কালু বলে — এর মধ্যে একটা মতলব বের করতে হবে। পথ একটা হবেই। ঘাবড়াস না।

ওরা কদিন ওই বাংলোর দিকে বিশেষ যায় না। নজর রেখেছে বিজয়ের উপর। সেদিন কালু দেখে ওই নতুন মেয়েটাকে। ছনু বলে,

— একা নয় রে। আবার এক লেড়কীও আসছে। বড় সাহেবও ওদের নিয়ে খেল কুদ করছে।

কালু বলে — অব আ গিয়া আইডিয়া।

ছনু বলে — কি আইডিয়া রে।

কালু বলে — যা-যা বলবো তাই করে যাবি। ওই ছোকরা কে দোস্ত বানাতে হবে। উভি হয়ে যাবে।

বিজয়-প্রিয়া এখন পুরোদমে প্রাকটিস চালাচ্ছে। ছনু-কালুও নজর রাখছে গাছ-গাছালির আড়াল থেকে। ওদিকে ভোম্বলও প্রিয়ার উপর নজর রেখেছিল। প্রিয়াকে সে বারবার চেষ্টা করেছে হাতে আনতে। প্রিয়া এখন কলেজে গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে, ওদের দলের সঙ্গেই মেশে।

আকাশ বলে, — কি রে ভোম্বল, প্রিয়া যেন তোকে চেনেই না। কি রে তুই? একটা মেয়েকে ম্যানেজ করতে পারিস না। ওই ছোঁড়াটা ওকে হাত করে নিল?

এবার ভোম্বলের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। সে বলে, — তোদের সামনে মেশে না। নাহলে প্রিয়ার সঙ্গে আমার রিলেশন খুবই গুড। ইয়ে মানে, লাভেও পড়েছে আমার। তবে খুব চালাক মেয়ে। সহজে ধরা দিতে চায় না।

হাসে আকাশ। — তাহলে টোপ গিলে এখন খেলছে। এবার টেনে তোল। রাজত্বি রাজকন্যা সবই পেয়ে যাবি ব্যাটা। ভোম্বলও সেই স্বপ্ন দেখছে।

সেদিন ফিরছে ওরা গাড়িতে। ভোম্বল দেখছে প্রিয়াকে। কপালে দু'একগাছা চুল এসে পড়েছে। সুন্দর মুখে চিন্তার ছাপ।

ভোম্বল বলে, — এত কি ভাবছ?

প্রিয়া জবাব দেয় না। এবার ভোম্বল সাহস করে ওর নরম হাতটা নিজের হাতে তুলে নিতেই চমকে ওঠে প্রিয়া ওর সাহসে। হাতটা সরিয়ে নিয়ে ভোম্বলের দিকে কঠিন চাহনিতে চাইল প্রিয়া। ভোম্বলও একটু ঘাবড়ে গেছে। সরে বসে সে।

প্রিয়া বলে, — ড্রাইভার, একটু গাড়ি থামাও!

ড্রাইভার থামাতে ভোম্বল বলে — কি হলো?

— তেষ্টা পেয়েছে, ডাব খেতে হবে।

ভোম্বল বলে — চলো, তেষ্টা পাবারই কথা। যা ভাপ্সা গরম!

ভোম্বল নিজে নেমে গিয়ে ওদিকে একটা ডাবওয়ালারা কাছে গিয়ে বলে — দুটো ভালো দেখে ডাব কাটো।

ডাবওয়ালা এর মধ্যে একটা ডাব কেটে ভোম্বলকে দেয়। ভোম্বল ডাব খাচ্ছে। প্রিয়া এর মধ্যে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলে — গাড়ি চালাও।

ড্রাইভার বলে — ভোম্বলবাবু ডাব খাচ্ছেন।

— খান। উনি চলে আসবেন। আমাকে একবার সাইকেলের দোকানে যেতে হবে। বেন্টিক স্ট্রীটে চলো সিধে।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে হুস করে বের হয়ে যায়। ওদিকে ভোম্বল তখন ডাবের জল খেয়ে শাঁসলা ডাবটা কাটিয়ে শাঁস খেতে ব্যস্ত। হঠাৎ গাড়িটা চলে যেতে দেখে আধ কাটা ডাবের খোলা হাতে আর মুখে কিছুটা শাঁস পোরা অবস্থাতেই হাঁক পাড়ে, এ্যাই - এ্যাই গাড়ি থামাও। আমি এখানে।

কিন্তু প্রিয়া ইচ্ছা করেই এই ঠা ঠা রোদ্দুরে ওকে পথের মাঝে ফেলেই চলে যায়। ভোম্বলবাবুর পকেটও গড়ের মাঠ। এবার মাথায় হাত ভোম্বলের। বৌবাজার থেকে শ্যামবাজার, এতটা পথ ওকে হেঁটেই ফিরতে হবে। প্রিয়ার হাত ধরতে সাহস করার জন্য এতবড় দাম দিতে হবে তাকে এটা সে ভাবেনি।

প্রিয়া অবশ্য এর মধ্যে বিদেশী সাইকেল নিজের টাকাতেই কিনেছে। সাইকেলটা এতদিন কেনেনি প্রিয়া, কারণ বাড়িতে নিয়ে গেলে কাকাবাবু ভোম্বল সেটাকেও সরিয়ে রেখে দেবে। এখন ওই কর্নেল আংকেলের বাংলোতে তারও যাতায়াত চলছে। সাইকেলটা সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করেই সেটা কিনেছে। আজ সেটা নিয়ে আসে কর্নেল সাহেবের বাংলোতেই।

ড্রাইভার শশীবাবু প্রিয়ার বাবার আমলের লোক। মানুষটা সৎ। সেও কিছুটা অভিযোগ পায় প্রিয়ার ব্যাপারে। ওই ব্রজবাবু আর তার স্ত্রী যে কৌশলে প্রিয়ার যথা সর্বস্ব দখল করতে চায়, এটাও বুঝেছে শশীবাবু।

আর ওই ভোম্বলবাবুকেও চিনেছে শশীবাবু। এক নম্বর বখাটে ছেলেটা।

এর মধ্যে প্রিয়ার টাকাতেও হোটেল বারেও যায়। কাপ্তানী করে আর কৌশলে সেও প্রিয়াকে দখল করে সর্বস্ব পেতে চায়।

শশীবাবু চাকরী করে পেটের দায়ে। তাই ব্রজবাবুর অনেক অন্যায় কাজ, দু-নম্বরী ধান্দা দেখেও চুপ করে থাকে।

প্রিয়া বলে — শশীকাকা, সাইকেলের কথা ওদের জানাবেন না।

শশী বলে — না, না।

ওদিকে ভোম্বল ফিরছে গলদঘর্ম হয়ে।

ললিতা বলে — কিরে, গাড়িতে ফিরিসনি?

ভোম্বল তখন এতটা পথ হেঁটে হাপাচ্ছে। ঘামে পাঞ্জাবীটা মোটা গায়ে সেটে বসেছে। বলে

— ওই প্রিয়ার কথা বলো না পিসী, ও ডেঞ্জার মেয়ে। মাঝপথে আমাকে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

— সেকি! কোথায় গেল? এবার উৎকণ্ঠিত হয় ললিতা। বলে সে — এখনও' ফিরলো না। তোকে ওর দিকে নজর রাখতে বললাম আর তুই, কোন কম্মের নোস! তোর চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেল!

দেখা যায় গাড়িটা ফিরছে। প্রিয়া গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে চলে গেল। এদের দিকে একবার দেখে।

ভোম্বল বলে — এতক্ষণে ফেরা হলো!

ললিতা বলে — এবার ওর দিকে কড়া নজর রাখ। ওর ভাব-সাব ভালো ঠেকছে না ভোম্বল। শেষে কোন সর্বোনাশ না বাধায়।

ভোম্বলও এবার চটে উঠেছে প্রিয়ার উপর। তাই ভোর থেকেই সে নজর রেখেছিল। এ-বাড়ির ঘুম তখনও ভাঙেনি। প্রিয়া এবার নতুন সাইকেল নিয়েই প্রাকটিস করে মাঠে। আজ বেশ ভোরে উঠেই বেরিয়ে যায়। ও খেয়াল করেনি, ভোম্বলও নজর রেখেছিল। প্রিয়া বের হতে ভোম্বলও একটু অপেক্ষা করে প্রিয়ার যে সাইকেলটা সে দখল করে রেখেছিল, সেইটা নিয়ে এবার প্রিয়াকে ফলো করে চলেছে।

বিজয় অবশ্য পার্কের ওদিকে প্রিয়ার জন্য আজও অপেক্ষা করেছিল। প্রিয়া আসে এখানে। বিজয় তাকে নিজের সাইকেলে নিয়ে বাকী পথটা গিয়ে প্রাকটিসে নামে।

ভোম্বল কিছুটা এসে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়। প্রিয়া-বিজয়ের এই ঘনিষ্ঠতা যে এমনি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা জানতো না ভোম্বল। বিজয়-প্রিয়া অবশ্য ভোম্বলকে দেখেনি। ওরা চলেছে খুশী মনে। পিছনে ভোম্বলও চলেছে। ওকে দেখতে হবে ওরা কোথায় যায়। ওদের অভিসারের জায়গাটাও দেখতে হবে তাকে।

ছনু-কালুও এবার মতলব করেছে বিজয়কে তাদের হাতে আনতে হবে। বড় সাহেবকে খুশী রাখতে হবে তাদের। তারা চায় বিজয়ও যেন তাদের সম্বন্ধে সাহেবকে কিছু না বলে। তারাও তাই কি ভাবে বিজয়ের কাজে লাগা যায়, সেই পথই খুঁজছে এই কদিন ধরে। তেমন পথ কিছু পায়নি। কিন্তু ওই মেয়েটাকে বিজয়ের কাছে রোজ ভোরে আসতে দেখে কালু বলে, — ছনু সুন্দরী মেয়ে আসে ওই ছেলেটার কাছে। এবার কেস গড়বড় হবে।

— মানে! ছনুর বুদ্ধি বিবেচনা একটু কমই।

কালু বলে — আরে, সুন্দরী মেয়েছেলের পিছনে একটা ছেলেই থাকে না, দু'দশজন লাইন মারে, তাই টক্করও বাধে। এখানেও বাধবে। আর ব্যস্ আমরা মদত দেব বড় সাহেবের ওই রিস্তাদারকে। তাহলেই ওভি জানবে যে ওর দরকার পড়বে আমাদের। আর ব্যস্ ছেলেটাও আমাদের বাত আর কিছু বলবে না বড় সাহেবকে। ওভি ফিট, হামরাও ভি ফিট।

ওরা তাই আজ নজর রেখেছিল বিজয়-প্রিযাদের উপর, আর দেখে একটা মোটা মত ছেলে, গলায় সোনার হার একটা ফরেন সাইকেল নিয়ে ফলো করছে বিজয়দের।

কালু বলে — ক্যা রে ছনু, ঠিক বোলা না। ওই কুমড়ো পটাশ মার্কা ছোকরা ভি মোহাব্বৎ করে মেয়েটাকে। তাই ফলো করছে। ফরেন সাইকেল — গলায় হার।

পথ ঘাটে লোকজনও নেই। ওদিকে গাছগাছালিও কিছু আছে। ভোম্বল এবার হাতে নাতেই ধরে ফেলবে প্রিয়ার সবকিছু। তারপর সব কথাই গিয়ে বলবে বাড়িতে। দরকার হয় পিসীমা-পিসেমশাইকেও নিয়েই চলে আসবে। প্রিয়াকে এবার উচিত শিক্ষাই দেবে সে।

হঠাৎ নির্জন পথের পাশ থেকে একজন লাফ দিয়ে এসে ওর সাইকেলটা চেপে ধরতে মোটা ভোম্বল ব্যালেন্স হারিয়ে পথেই ছিটকে পড়ে। সাইকেলটা তখন ছনুর হাতে। ভোম্বল গর্জে ওঠে।

— ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে! ইডিয়ট কোথাকার। এবার মাটি ফুড়ে যেন কালুর আবির্ভাব ঘটে। কালুর হাতে একটা বামপুরী ছোরা। বোতাম টিপলেই হিস্ হিস্ শব্দে সাপের ফনার মতে ছোরার ফলাটাও বের হয়ে আসে। ভোম্বল চমকে ওঠে।

কালু বলে—চোপ বে।

গলার হারটা দেখে বলে—মেয়েদের মত সখ করে আবার হারপরা হয়েছে। ক্যা-বে মটুরাম! প্যার মহাব্বৎ চলছে বুঝি!

ভোম্বল দেখছে ওদের। বলে সে—সাইকেল দাও।

কালু ফুঁসে ওঠে — আ বে কাবাবমে হাড্ডি, উ হার খুলে দিয়ে ইহাসে ভাগ। খোল হার —

কালুও এবার ভোম্বলের গলার হারটা খুলে নিয়ে পিছনে একটা লাথি কসে বলে,—চুপচাপ ফোট বে!

ছনু বলে— নাহলে দেব শালার কুমড়ো ফাঁসিয়ে—পেটের উপর ছোরাটা ধরতেই ভোম্বল বুঝেছে সমূহ বিপদ। সে তখন প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করে।

ব্যাপারটা দেখছিল প্রিয়া-বিজয়ও। ভোম্বলের সাইকেল-হার কেড়ে নিয়েছে ওরা। বিজয়ও চিনেছে ওদের। বলে — এইভাবে রাহাজানি, ছিনতাই করবে?

প্রিয়া বলে — ওই ভোম্বলটা শয়তান। ও আমাকে ফলো করছিল। ওর ছিনতাই করে ঠিক করেছে ওরা। আর কোনদিন ফলো করবে না। শান্তিতে আসতে পারবো।

বিজয় বলে — কিন্তু ওরা ঠিক করেনি। ওই লোকদুটো আমাকেও বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

এবার ছনু-কালুই এগিয়ে আসে। বলে,

—মাপ কিজিয়ে ছোটা সাব। আপনি আমাদের কর্নেল সাহেবের রিস্তাদার, সেদিন জানতাম না। মিসটেক হয়ে গেছিল সাব।

ছনু বলে—আমরা ফুলটাইম ছিনতাই কাজ করি না স্যার। বড় সাহেবের কারখানায় কাজ করি, ওখানেই থাকি।

কালু বলে—মাঝে মাঝে প্রাকটিসটা বজায় রাখতে টুকটাক এসব করি। উ শালা এই দিদিমণিকে ফলো করছিল স্যার। তাই শালাকে একটু স্যামপল দেখিয়ে দিলাম। শালা সাইকেল ভি ফেলে পালালো।

প্রিয়া বলে—এ তো আমার সাইকেল। ভোম্বলই কেড়ে নিয়েছিল। কাকাকে বলে। কাকাই ওকে হয়তো পাঠিয়েছিল।

কালু বলে—সাইকেল নিয়ে নিন মেমসাব। আর কাকা না ফাকা কার নজর পড়েছে বলেন। তাকে ভি কিছু স্যাম্পেল ছেড়ে দেবে এই বান্দা।

বিজয় দেখছে ওদের। দুটি যেন বিচিত্র জীব।

বিজয় বলে—থাক্, আর ঝামেলা পাকাতে হবে না।

কালু বলে—তাহলে মাপ করে দিলেন স্যার।

বিজয় বলে—ঠিক আছে। তবে এসব কাজ আর করো না। আমিও বড় সাহেবকে কিছু বলবো না।

কালু বলে—বহুৎ খুব স্যার। লেকিন ইসব কাজ করা ঠিক কাম নয় তা জানি। কিন্তু স্যার চোরের দুনিয়া-শয়তানের দুনিয়াতে বাঁচতে গেলে ইনসানকে ভি কভি কভি চোর শয়তান হতে হয়। বাতটা একদম ঠিক। সেই বাত আপনারাও ভি মালুম হবে। চলি স্যার—নমস্তে।

ছনু বলে—বড় সাহেবের কারখানার কোয়াটারে থাকি স্যার। ছনু কালু সর্দার বললে সব কোই পাতা বাতলে দেবে।

ওরা চলে যায়।

বিজয় বলে—তাহলে ভোম্বল তোমার কাকাবাবুর গুপ্তচর!

প্রিয়া বলে—গুপ্তচরই নয়। কাকাই বাবা মারা যাবার পর বাবার কারখানা —অফিস সব দখল করেছেন। বলেন বাবাই নাকি ওকে সব কাজ দেখার জন্য পাওয়ার অব এ্যাটর্নী দিয়ে গেছেন। আমার সই সবুদেরও দরকার নেই। আর বাড়িতেও কাকীমা। কোথা থেকে ওই মোটকা ভোম্বলকে এনে আমার পিছনে লাগিয়ে আমার লাইফ হেল করে দিয়েছে। তাই তো বলছিলাম ওই ছনু-কালু ভোম্বলকে শাসিয়ে ঠিক কাজই করেছে। ও আমার সাইকেলও কেড়ে নিয়েছিল, যাতে স্পোর্টস-

এ যোগ দিতে না পারি আর আকাশের প্রেমিকা যমুনাই চ্যাম্পিয়ান হয়।

বিজয় বলে—এসব তো জানতাম না। দেখা যাক এবার কারা চ্যাম্পিয়ান হয়।

ভোম্বল সর্বস্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছে কোনমতে প্রাণটুকু নিয়ে। সাইকেলটাও গেছে আর গেছে পিসীমার দেওয়া দামী হারটাও। বাইরের ঘরে ঘর্মাক্ত অবস্থায় হাঁপাচ্ছে। এমন একটা দারুণ ঘটনা হাতে নাতে ধরতে পারল না — সব ঠিকানাও পেতো। তারপর প্রিয়াকে বাধ্য করতো তার হাতে আসতে। কিন্তু কিছুই হয়নি। বিজয় প্রিয়া কোথায় পথের আড়ালে চলে গেল। ভোম্বলেরও সব হারিয়ে গেল ওই ছিনতাইবাজদের হাতে।

পিসীমা ঘরে ঢুকে বিদ্ধস্ত অবস্থায় ভোম্বলকে দেখে শুধায়.

—কি হলে রে?

আসল কথাটা বলতে পারে না ভোম্বল। এ তার নিদারুণ অপমানের কথাই। বলে যে,

—ইয়ে মানে মর্নিং ওয়াক করতে বলেছে ডাক্তার। তাই গেছিলাম। ভোম্বল পিসীমাকে এড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। ললিতা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কিন্তু প্রিয়াও ঘরে নেই, তার যেন কেমন কেমন ঠেকে।

ভোম্বল অবশ্য কলেজে এসে কথাগুলো আকাশকে সব জানায়। ওর বন্ধুদেরও। প্রিযার সাইকেল, তার হারও নিয়ে গেছে ছিনতাই পার্টির লোক। বিজয়-প্রিয়াদের জন্যই তাকে এইভাবে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আকাশ বলে—স্পোর্টস হয়ে যাক। সব ট্রফিগুলো নিই, তারপর কলেজের খেলা শুরু করবো। তখন বিজয়-প্রিয়া আর ওদের দলকেই সযুত করে দেব। ভূপেন-ন্যাপা সব রেডি করে রাখবি। ওদের দল যেন পাত্তা না পায়।

স্পোর্টস-এর দিন এসে গেছে। কলেজ থেকে এলাকার বেশ কিছু নামী দামী লোকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কর্নেলও নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। সেদিন ওদের প্রাকটিসের পর বাগানে বসে কর্নেল বলেন — কাল আমিও যাচ্ছি। বিজয়-প্রিয়া তোমাদের জিততেই হবে। আর তোদের

জিতও হবে আমার জিৎ। মনে রেখো, আমি সমরজিৎ লড়াই-এর ময়দানে হার মানিনি।

কর্নেলের ভালো লাগে দুটি তরুণ-তরুণীকে। ওরা যেন দুরন্ত যৌবনের প্রতীক। নিজের ছেলে অকালে মারা গেছে কর্নেলের। লোভী একশ্রেণীর মানুষের লোভের বলি হয়েছিল তার পরিবার। সেই লোকগুলোই তার বাড়িঘরও কেড়ে নিয়েছে। এখনও তাদের অন্যায়ের জবাব দিতে পারেনি সে। সেই শক্তিমান মানুষগুলো আজও সমাজে মাথা তুলে ঘুরছে।

ব্রজকিশোর আজ শিল্পপতি। ওর সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে লোভ-পাপ আর মিথ্যার উপর। তবে সেই প্রাসাদের মূলে কর্নেল কোন আঘাতই করতে পারেনি। কিন্তু থেমে থাকলে চলবে না। তাই যেন সমরজিৎ পাশে চায় বিজয়কে।

বিজয় বলে—আমরা চেষ্টা করবো স্যার।

কলেজের মাঠটাকে সাজানো হচ্ছে। রঙ্গীন কাগজের মালায়। ওদিকে নিমন্ত্রিত অতিথিরাও এসেছেন। প্রিন্সিপ্যাল তাদের তদারক করতে ব্যস্ত মাঠের চারিপাশে ছেলে-মেয়েদের ভিড়। বিচারকরাও মাঠে রয়েছে।

আকাশ, ভূপেন, যমুনা তাদের দলের সকলেই তৈরী। এদিকে বিজয়ের দলও। মাইকে ডাকা হচ্ছে পাঁচশো মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিদের। এই দৌড়ের প্রথম পুরস্কার গতবার আকাশ পেয়েছে। এবারও পাবে জানে সে। সে এসে স্টার্টিং পয়েন্টে দাঁড়ায়। বিজয়ও এসে দাঁড়ায়। আকাশ একবার বিজয়ের দিকে চাইল অবজ্ঞা ভরে। আরও কয়েকজন রয়েছে রেসে। ভূপেনও রয়েছে

দৌড় শুরু হয় ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে। কলরব ওঠে। ছেলেমেয়েরাও দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর দেখা যায় বিজয়ের দলের সমর্থকরাই বেশী আকাশ মোটামুটি ভালোই দৌড়ায়। প্রথম থেকেই সে এগিয়ে রয়েছে। সে জানে, তাকে হারাবার মত কেউ নেই। তাই একটু গা এলিয়ে দিয়েই ছুটছে সে।

ফাস্ট ল্যাপ হয়ে গেছে। বিজয় জানে কখন গতিবেগ বাড়াতে হবে ওদিকে চীৎকার উঠেছে। ভূপেন-ভোম্বল-যমুনারাও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে

— আকাশ - আকাশ —

প্রিয়ার বুক কাঁপছে। সৌমেন অনিমেষরাও চীৎকার করে, — ওয়েক ল্যাপ বিজয়। লাস্ট ল্যাপ - ওয়েক আপ - ওয়েক আপ্। কর্নেলও দেখছেন বিজয় এবার গতিবেগ বাড়াচ্ছে। কর্নেলও খুশী। এই ঠিক সময়ই বিজয়ই মুভমেন্ট শুরু করেছে। এবার সে দৌড়ায় হরিণের মত। আকাশও চমকে ওঠে, তাকে পিছনে ফেলে বের হয়ে গেল বিজয়। ওদিকে আকাশের দলও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে,

— আকাশ, কাম অন্। আকাশ —

আকাশ দেখছে বিজয় তার আগে। ক্রমশঃ গতিবেগ তার বাড়ছে ফিনিসিং পয়েন্টের কাছাকাছি এসে। আকাশও মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু আর মেক আপ করতে পারে না। তুমুল জয়ধ্বনি ওঠে। এটা যে আকাশের জন্য নয় তা বুঝেছে আকাশ। বিজয় এবার ফাস্ট হয়। কর্নেল সাহেবও খুশী। ওদিকে আকাশের দল অসহায় রাগে অপমানে ফুঁসছে।

ভোম্বল বলে—ব্যাটা বিজয় জিতে গেল!

ভূপেন বলে—আরে, এক মাঘে শীত যায় না। থাউজেন্ড মিটার রেসও আছে। দেখা যাবে, ওখানে আর দাঁড়াতে পারবে না বিজয়। বস্, একটু গ্লুকোজ মধু খেয়ে দম নাও। এবার বাজি মারতেই হবে।

এবার ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিজয় পড়াশোনাতে ভালো। কলেজে সেই সুনামই তার ছিল। সৎ ছাত্র বলে ভালবাসত সকলে। আজ দেখিয়ে দিয়েছে, ওই আকাশকে সে সবদিক থেকে হারাবার যোগ্যতাই রাখে।

হাজার মিটার দৌড়ে এবার ভূপেনই বিজয়ের পাশের ট্র্যাকে রয়েছে। বিজয়ও বুঝেছে এবার ওরা জিতবার জন্য কিছু নোংরামিও করতে পারে। আকাশ ভূপেনের মধ্যে তেমন ইশারাই হয়। ওরা দুজনে তাই যেন বিজয়ের দুই দিকের ট্র্যাকেই দাঁড়িয়েছে। ওদের মতলব, দৌড়ের ফাঁকে কোনমতে ধাক্কা মারতে পারলেই বিজয় গতিবেগের সময় তাল সামলাতে পারবে না। ছিটকে পড়বেই। আহতও হতে পারে। ফলে আকাশই জিতে যাবে।

বিজয় দৌড়াচ্ছে। হাজার মিটার - দীর্ঘ পথ। এদিকে এবার ভূপেন-আকাশ দুজনেই বিজয়কে চাপার চেষ্টা করে। বিজয় ধাক্কা খেয়েও টাল সামলে দৌড়াচ্ছে। মাঠের বাইরে বিজয়ের সমর্থক বাহিনী এবার আরও জোরে চীৎকার করে।

এই দৌড় তাদের জিততে হবে। এর উপর নির্ভর করছে তাদের টিকে থাকার
প্রশ্ন। আর বিজয়কে জিততেই হবে। তার মনে পড়ে কর্নেলের কথা। সব
বাধা জয় করে জিততে হবে। দেখে বিজয়, এবার ভূপেন-আকাশ মরিয়া
হয়ে তাকে আঘাত হানার জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু বিজয় নিমেষের মধ্যে
তার গতিবেগ বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। আর সেই মুহূর্তেই বিজয়কে না পেয়ে
আকাশ-ভূপেন দুজনে দুজনকেই ধাক্কা মেরেছে। আর গতিবেগ সামলাতে
না পেরে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়ে। আকাশের তত বেশী লাগেনি, ও উঠে
পড়ে আবার দৌড় শুরু করে। ভূপেন বেশী চোট পেয়ে ট্রাক থেকে বের
হয়ে আসে। বিজয় তখন অনেক এগিয়ে গেছে। মাঠ মুখর হয়ে ওঠে তার
দলের ছেলে মেয়েদের চীৎকারে। এবারও বিজয় ছিনিয়ে নিল সেই পুরস্কার।
আকাশ তার দলবলের জয়ধ্বনি এবার থেমে গেছে। তাদের নেতাই যে
একেবারে ন্যাতা হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

এদিকে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। আকাশ কোন ইভেন্টেই জিততে পারেনি।
তার আসন ছিনিয়ে নিয়েছে আজ বিজয়। নতুন সেই ছেলেটি এবার আকাশকে
বিপর্যস্ত করেছে।

যমুনাও ঘাবড়ে গেছে আকাশের এই পরাজয়ে। যমুনা সাইকেল রেসের
চ্যাম্পিয়ান ছিল এতদিন। এবারও সে আশা করে জিততে। কিন্তু প্রিয়াও
নাম দিয়েছে। এদিকে আকাশের বিপর্যয়। বলে যমুনা,

—এবার কি হবে রে ভূপেন, আকাশ তো আউট হয়ে গেল! আমারও
ভয় হচ্ছে।

আকাশ বলে — নিজেদের ভুলে আউট হয়ে গেলাম। তবে তুই জিতবিই।
আর খেলায় তো হারজিৎ আছেই রে। ভূপেন — সব ঠিকঠাক করে রেখেছিস
তো?

ভূপেন - ভোম্বল দুজনেই ছিল। বলে ভোম্বল,

—ভূপেন, কাজ সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। দেখবে যমুনা, প্রিয়া কোন
অবস্থাতেই জিততে পারবে না রেসে।

ওদিকে সাইলে রেসের নাম ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। মাঠে একে একে
মেয়েরা সাইকেল নিয়ে নামছে। যমুনাও এগিয়ে যায়। ওদিকে বিজয়দের
দলে তখন হৈ চৈ চলছে। বিজয়ই নয়, তাদের দলের চার পাঁচজন অন্যসব

ইভেন্টে আকাশের দলের ছেলেমেয়েদের হারিয়ে প্রাইজ পেয়েছে। এবার প্রিয়াও সাইকেল নিয়ে নামতে যাবে, হঠাৎ দেখে তার নতুন দামী বিলেতী সাইকেলের চাকার হাওয়াই নেই। একটা চাকার ব্রেকও খোলা। চমকে ওঠে প্রিয়া — একি এসব কি করে হলো?

বিজয় দেখে প্রিয়ার সাইকেলটাকেই গোপনে কে এইভাবে তছনছ করে দিয়েছে। সময়ও নেই ওসব সারাবার। আর এই সাইকেল নিয়ে মাঠে নামাও যাবে না। প্রিয়া আতর্কণ্ঠে বলে — এখন কি হবে?

ওরাও অসহায়। ওদিকে নাম ডাকার পর্ব শেষ। এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে রেস স্টার্ট হবে। প্রিয়ার চোখে জল। সেও চেয়েছিল উচিত জবাব দিতে। তার জন্য এতদিন ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে। কিন্তু সব কিছু এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

লাস্ট মিনিট কল হচ্ছে মাইকে। এবার বিজয়ই দৌড়ে গিয়ে ওর নিজের সেই দামী সাইকেলটা এনে প্রিয়াকে দিয়ে বলে — রাস্ আপ। এই সাইকেলেই তো প্রাকটিস করেছো, এতেই হবে।

প্রিয়া সাইকেলটা পেয়ে নিমেষের মধ্যে শেষ মুহূর্তে গিয়ে স্টাটিং লাইনে দাঁড়ায়। উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে। আকাশ-ভূপেনরাই এই কাজটা করেছিল।

যমুনা ভাবেনি যে প্রিয়া শেষ মুহূর্তে এসে পড়বে। সেও জানে ভোম্বল-ভূপেন নিশ্চয়ই কিছু করেছে প্রিয়াকে ট্রাক থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রিয়াকে দেখে সেও ঘাবড়ে গেছে।

এবার রেস শুরু হয়েছে। প্রিয়াও এবার মরীয়া হয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। বিজয়ের সাইকেলেই প্রাকটিস করে এসেছে সে এতদিন। সেটা পেয়ে ভালোই হয়েছে। সে যমুনাকে ধরার জন্য জোর প্যাডেল করছে। ওদিকে আকাশ-ভূপেন-ভোম্বলও অবাক হয়।

আকাশ বলে, — কি রে, বলছিলি ট্রাকেই আসবে না প্রিয়া। ও এল কি করে? আর যমুনাকে তো ওভারটেকই করছে।

এদিকে বিজয়ের দল তখন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, — প্রিয়া, মার মার যমুনাকে।

যমুনাও বুঝেছে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে হবে। সে প্রাণপণে চালাচ্ছে। প্রিয়া তার পাশে এসে গেছে। দুজনে চলছে পাশাপাশি।

ওদিকে বিজয় তার দলবল চীৎকার করছে,—ওয়াক্ আপ প্রিয়া। জোরে—

প্রিয়ার দেহমনে যেন কি নতুন শক্তি আসে। সে আরও জোরে চালাচ্ছে। দূরে দেখা যায় ফিনিশিং পয়েন্ট। প্রিয়া সর্বশক্তি দিয়ে প্যাডেল করে চলেছে। যমুনাকে সে পিছনে ফেলে সে বেশ কয়েক সেকেন্ডেই ফিনিশিং পয়েন্ট পার হয়ে যায়।

ওদিকে বিজয় অন্যান্যরা অপেক্ষা করছিল। বিজয়ই ওকে সাইকেল থেকে নামায়। জয়ধ্বনি ওঠে,

—প্রিয়া জিন্দাবাদ। জিতলো কে—

যমুনা দুবছর পর তার সেই জায়গা হারিয়ে মাথা নীচু করে চলেছে। আকাশ-ভূপেনরাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভোম্বল গজরায়

—খুব মাতামাতি হচ্ছে। ঠিক আছে। পরে দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

কর্নেলও দেখেছেন ব্যাপারটা। পুরস্কার বিতরণী সভায় নিজেই পুরস্কার তুলে দেন বিজয়-প্রিয়া অন্যদের হাতে। যমুনা দ্বিতীয়া হয়েছে। সেও মাথা নীচু করে পুরস্কার নিয়ে গেল মাত্র। আকাশ-ভূপেন-ভোম্বলরা দেখছে কর্নেল সাহেব ওই বিজয়-প্রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছেন।

আজ কর্নেলও খুশী। তার ট্রেনিং দেওয়া ব্যর্থ হয়নি। দুজনেই অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে জয়ী হয়েছে।

কর্নেল বলেন — আজ তোমাদের জন্য পার্টিই দেব। এখান থেকে সোজা আমার ওখানে চলে এসো তোমাদের বন্ধুদের নিয়ে। বিজয় তার বন্ধুরাও খুশী। তারা বলে,

—তাই হবে স্যার।

ভোম্বলও কান পেতে-আড়ি পেতে ছিল। তারও মনে হয় ওই ভদ্রলোক এদের চেনে। কর্নেল যে এরা জিততে খুব খুশীই হয়েছেন, ওদের জেতার খুশীতে পার্টি দিচ্ছেন, সেটাও শুনেছে। কিন্তু ওদের জায়গাটার সন্ধানও করতে হবে। আকাশ গজগজ করে। বলে,

—খুশীতে পার্টি হবে! উঃ এরপর কলেজে মুখ দেখাবো কি করে কে জানে! ভোম্বল তুই কোন কর্ম্মের নোস। তুই বলিস, প্রিয়ার গার্জেন তুই-

ও তোর কথামত চলে। ছাই! তোকে লাথি মেরে বিজয়টার সঙ্গে ভিড়েছে। তোর মুরোদ বোঝা গেছে।

ভূপেনও বলে — ঠিক বলেছিস!

ভোম্বল বলে — না। দেখবি এই ভোম্বলের খেল। তোদের খেল তো খতম হলো, এবার আমার খেল শুরু হবে।

ভোম্বলও জানে প্রিয়াকে তার হাতে আনতেই হবে। না হলে প্রিয়া হাত ফসকে বের হয়ে যাবে। পিসেমশাইও তাকে আর এই বাড়িতে রাখার দরকারও মনে করবে না। তাকে গ্রামেই ফিরে যেতে হবে। এ ভোম্বলের বাঁচা মরার লড়াই। প্রিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

কর্নেল সমরজিৎ তার বাংলোতে আজ ওদের জন্য ছোট খাটো পার্টির আয়োজনও করেছেন। আজ ওই স্পোর্টস-এর লড়াই-এর মধ্যে তিনি যৌবনের প্রদীপ্ততার স্পর্শকে যেন ফিরে পেয়েছেন।

বাগানে টেবিল সাজিয়ে পার্টির ব্যাপার চলছে। এখন ছনু-কালুও নিশ্চিন্ত হয়েই বাংলোতে আসে। প্রিয়া-বিজয়ও চেনে তাদের। বাংলোর কাজের লোকেরাও ব্যস্ত। ওদিকে গাছগাছালি ঘেরা মাঠে আলো আধারের পরিবেশ। ছনু-কালুও পার্টির থেকে কিছু মাংস-বিরিয়ানী নিয়ে ওদিকে গাছগাছালির আলো-অন্ধকারে বসে মদের বোতল খোলে।

ছনু বলে — মাংসটা বেশ ভালোই হয়েছে।

ছনু-কালু মদের বোতলে চুমুক দিচ্ছে। ওরা শিকারী বিড়াল। চুরির কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অন্ধকারে ওদের নজর চলে।

হঠাৎ দেখে একটা ছায়ামূর্তি গাছের আড়াল থেকে বাংলোর বাগানের দিকে চেয়ে আছে। বাগানে ছেলে-মেয়েদের হৈ হুল্লোড় নাচগান চলেছে। এই ছেলেটা দেখছে দূর থেকে তাদের উল্লাস। ভোম্বল আজ কলেজ থেকেই ওদের পিছু নিয়ে এসেছে এই জায়গাতে। বেশ বুঝেছে ভোম্বল, প্রিয়াও এখানে প্রায়ই আসে। এখানের লোকজন তার চেনা। আরও বুঝেছে বিজয়ও এখানেই থাকে। অর্থাৎ দুজনে এখানেই প্রেমলীলা করে। আর ওদের এসব অভিসারের কথা জানে এই কর্নেল নিজেও।

ভোম্বল এমন জরুরী খবরটা পেয়ে এবার যে একটা চরম অস্ত্রই হাতে

ফেলেছে।

— ক্যা রে মটুরাম। ইখানে?

ভোম্বলও দুই মূর্তিকে দেখে চমকে ওঠে। চিনেছে তাদের। সেইদিন সকালে এরাই তার গলার হার সাইকেল কেড়ে নিয়েছিল। আজ আবার এখানে এইসময় ওদের দেখবে তা ভাবেনি ভোম্বল।

বলে — ইয়ে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।

ছনু বলে — ইতো যাবার পথ নয় মোটুরাম। ইখানে কেনো এসেছ, বলো। নাহলে —

কালুও কি ভাবছে। বলে,

—সেদিনও ওদের ফলো নিয়েছিল। বিজয়বাবু আর মেমসাহেবের। আজ ভি ফলো লিতে লিতে খাস জায়গাতে এসে গেছে। কি কেসটা বলতো মোটুরাম? ওই মেমসাহেবের উপর ফলো নিচ্ছ? এ্যা—

ভোম্বল হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। বলে — না, ইয়ে, এবার ছেড়ে দাও। আর আসবো না।

—ঠিক বলছ? কালু বলে। তোমার মতলব সুবিধার নয়। ডালমে কুছ কালা আছে।

ভোম্বলের পকেটে শ-তিনে টাকা ছিল। সেটা বের করে বলে,

—নাও। মাল খাবে। আমি যাচ্ছি। আমাকে যেতে দাও।

ছনু অবশ্য তেমন কিছু দেখেনি। তাই টাকা দেখে বলে — ছেড়ে দে কালু।

কালু বলে — ঠিক আছে। তবে মোটুরাম, এদিকে যখন তখন এসো না। কর্নেল সাব ডেঞ্জার আদমী। দেখলে ফায়ার করে দেবে।

ভোম্বল ছাড়া পেয়ে দৌড়ালো। আজ সে একটা হেস্ত নেস্ত করবেই।

ব্রজকিশোর এতদিন ধরে বহু লোকের সর্বস্ব লুট করেছে নানা ভাবে। অনেকের জমি বাড়ি দখল করে সেখানে বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েছে। বিক্রী করেছে। সে দেখেছে টাকা থাকলেই আজকের সমাজে সকলের মাথার উপর ওঠা যায়। আর একটা সমাজ— এখন যারা দেশকে শাসন করছে, তাদের

পারলে আইনও তাকে কিছু বলবে না। বরং তাকে রক্ষা করার পথই বাতলে দেবে অনেক রথী মহারথী।

ব্রজকিশোর এইভাবে প্রচুর টাকা-প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনেক কিছু পাবার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

এখন ব্রজকিশোর সমাজে শিল্পপতি বলেই পরিচিতি! কয়েকটা নামী ক্লাবের মেম্বার। এইসব ক্লাবে মদের গ্লাস হাতে বসে ব্যবসায়ী আর নেতারা দেশকে, দেশের মানুষকে শাসন এবং শোষণের পথ নির্ধারণ করেন। আর সরকারকে ঠকিয়ে কিভাবে লাখ লাখ টাকা বের করে নিজেদের পকেটে পোরা যায়, তারই গবেষণা চলে।

ব্যবসায়ীরা তাই মদত দেন হিস্যা দেন নেতাদেরও। ব্রজকিশোর এইভাবে বিরাট একটা অঙ্কের সরকারী অর্ডারও পেয়েছে। অবশ্য অনেক অর্ডারই সে পায়। এই অর্ডারটা তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণের আর গুরুত্বপূর্ণ।

বড় একটা নদীর উপর ব্রীজ তৈরী হচ্ছে। তারই অর্ডার। কোটি টাকার কাজ। এদিকে দাদার কারখানার কাজ। বর্তমানে প্রিয়ার নামেই সবকিছু। নানা কাগজে সইপত্র করতে হয় প্রিয়াকে। ইদানীং একটা বিপদে পড়েছে ব্রজকিশোর। এতদিন মেয়েটা ছিল নাবালিকা, লিগ্যাল গার্জেন হিসাবে ব্রজকিশোর যত্রতত্র সই করেছে। নানা ভাবে টাকা তুলেছে। কিন্তু এখন সে সাবালিকা। তাই বেশকিছু কাগজে প্রিয়ার সই চাই। আর প্রিয়াও সব কাগজপত্র না দেখে সই করে না।

ব্রজ বলে—এসব ফর্মাল ব্যাপার। সই করে দাও।

প্রিয়া দু'একবার প্রশ্নও করে। সহজে সই করতে চায় না। শেষে ব্রজের চাপে করে।

কিন্তু এই কোটি টাকার ব্যাপারে সই করালে প্রিয়া জেনে যাবে সবকিছু। কিন্তু না করালেও নয়। তাই ব্রজও সেদিন কাগজপত্রগুলো দেখাতে প্রিয়া বলে,

—আমাদের কোম্পানী এত টাকার কাজ করতে পারবে, এই সময়ের মধ্যে?

ব্রজও জানে এটা সম্ভব নয়। অবশ্য ব্রজকিশোর তার জন্য লাখ দশেক টাকাও খরচা করবে। অর্দ্ধেক মাল দিতে হবে। পুরোটাকাই পেয়ে যাবে।

আর সেই দশ লাখ টাকার সুবাদে অফিসাররাও চুপ হয়ে যাবে। সেটা জানাতে চায় না ব্রজ। কারণ বাকী টাকাটা তার পকেটে আসবে। কোম্পানীর ঘরে নয়। এতসব কৌশলের কথা প্রকাশ করতে নেই। তাই ব্রজ বলে,

—হ্যাঁ মা, আমাদের কারখানাও বেড়েছে। এ কাজ কিছুই নয়।

প্রিয়া বলে—শেষে গোলমাল হলে ......

আমি তো আছি মা। তোমাকে ভাবতে হবে না। কোন গোলমাল হবে না। সই করো।

প্রিয়া বলে — ওসব কাগজপত্র আমার কাছে থাক কাকাবাবু। আমি একটু দেখে শুনে কালই সই করে দেব।

চমকে ওঠে ব্রজকিশোর। এই কাজের জন্য মন্ত্রীর আশেপাশে আরও দু'তিনটে কোম্পানীর মালিক ঘোরাঘুরি করছে। আর প্রিয়াকেও তার কেমন যেন সন্দেহ হয়। তবু বলে ব্রজ,

—দেখার কি আছে মা। এতটাকার কাজ — কত লোক ঘুরছে। কোনমতে জমা দিয়ে অর্ডারটা করাতে হবে। দেরী করা যাবে না।

প্রিয়া বলে—কালই করে দেব।

কাগজগুলোতে প্রিয়ার সই চাই। তবু কাগজগুলো ব্রজ রেখে যেতে রাজী নয়। কাগজগুলো তুলে নিয়ে বলে ব্রজকিশোর,

—ঠিক আছে, কাল করে দিও। সব দেখে-শুনে পরশু জমা দিতে হবে। পরদিনই লাস্ট ডেট।

বেশ রেগেই বের হয়ে যায় ব্রজকিশোর।

ওদিকে ললিতা ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিল। ভোম্বল তখন চামচ দিয়ে একটা বড় আইসক্রীম খাচ্ছে। ওর মুখে এখানে ওখানে আইসক্রীম লেগে আছে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে খেয়ে চলেছে। ব্রজকে ঢুকতে দেখে ললিতা বলে,

—সই সবুদ করে দিল প্রিয়া?

আগুনে যেন ঘি পড়ে। দপ করে জ্বলে ওঠে ব্রজ। মেয়ের ডানা পালক গজিয়েছে। কলেজে যাবার নাম করে সকাল থেকে বের হয়। কোথায় যায় কে জানে। মনে হয় এখন ওকে পরামর্শ দেবার লোক জুটেছে। তাই কাগজে সহজে সই করে না। এটাতেও করলো না। বলে,

—কাল দেখে শুনে ভেবে চিন্তে করবো। পড়ে রইল কাজটা। এত টাকার কাজ।

ভোম্বল শুনছে কথাটা। ব্রজ বলে,

—আর ভোম্বল তো কোন কম্মেরই নয়। এতদিন ধরে বাড়িতে পুষছি, একটা মেয়েকে হাতে আনতে পারলো না! কায়দা করে! শুধু খেতেই আছে। অকর্ম্মা কোথাকার।

ললিতাও বলে,

—মেয়ের বিহিত একটা করো। ভালো কথায় ভোম্বলকে বিয়ে করতে রাজী নয়। আমি বাপু জোর জবরদস্তি করেই বিয়ে দেব। নাহলে যদি মেয়ে আর কারোও পাল্লায় পড়ে সর্বনাশ হবে।

কথাটা শুনেছে ভোম্বল। সে তখনও বিজয়ের সঙ্গে প্রিয়ার ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে সঠিক জানে না। আর বিজয়ের বাসাও জানে না। তাই প্রিয়ার এই নতুন বন্ধুর কথা ঠিক জানাতে পারে না। ললিতাই শুধায়,

—হ্যাঁরে ভোম্বল, ও তো কলেজে যায়। সেখানে অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মেসে? মানে একটু ইয়ে-টিয়ে, মানে প্রেম-ট্রেম করে?

ব্রজকিশোর বলে -- প্রেম! প্রেম করলে সেই ছোঁড়ারও বারোটা বাজিয়ে দেব। আমার নাম ব্রজকিশোর। জন্মের মত তাকে বেপাত্তা করে দেব।

অবশ্য দু-চারটে খুন-খারাপি, অপহরণ, লাশ গায়েব ব্রজবাবুর কাছে কোন বড় কাজ মোটেই নয়। এসব কাজ জায়গা জমির দখল নেবার জন্য করেছে। কর্নেল সমরজিতের মত লোকের ছেলেকেও শেষ করেছে। স্ত্রীও মারা গেছে তারই অত্যাচারে। সে কিছুই করতে পারেনি ব্রজকিশোরের, প্রমাণের অভাবে। সুতরাং একটা রাম-শ্যাম মার্কা ছেলেকে গায়েব করে দিতে ব্রজের সময় লাগবে না।

ভোম্বল কি ভেবে বলে—আমি কড়া নজর রাখছি পিসা।

ব্রজ বলে—তাই রাখ। তেমন কিছু দেখলে আমাকেও জানাবি। ওই ছেলের ব্যবস্থা করে প্রিয়ার ব্যবস্থাও করে দেব।

ভোম্বল চলে যায়। এবার প্রিয়ার সব খবর সেই-ই বের করবে।

ললিতা বলে—প্রিয়ার সম্বন্ধে এবার ভাবো।

হচ্ছে।

ললিতা বলে — ভোম্বলের সঙ্গে যদি বিয়েতে রাজী না হয়?

ব্রজের চোখ মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। বলে,

ওর ঘাড় হবে। জোর করেই বিয়ে দেব আইনগত ভাবে। তাতে র না হলে—বাবা গেছে। এটাও যাবে। আর ও গেলে আইনত সবকিছুর মালিক হবো আমি। বাঁচতে গেলে ওকে ভোম্বলকে বিয়ে করতেই হবে। না হলে—

বাকীটা ইশারায় বুঝিয়ে দেয় ব্রজকিশোর।

ভোম্বল বারান্দা থেকে ব্যাপারটা দেখেছে। সেও তার শ্রদ্ধেয় পিসেমশাই-এর খুনী রূপ দেখে শিউরে উঠেছে। ভয়ও পায় সে। প্রিয়ার কিছু হলে ভোম্বলেরও এ বাড়ির আরাম আয়েস ঘুচে যাবে। এমন রাজভোগ আর এত টাকা-গাড়িও জুটবে না। কথাটা ভাবছে ভোম্বল।

ভোম্বল আজ খুঁজে খুঁজে এসেছে কর্নেলের বাংলোতে। প্রিয়ার সম্বন্ধে আজ অনেক কিছুই জেনেছে সে। দেখেছে বিজয় প্রিয়া আজ দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। সেখানে ভোম্বলের জন্য কোন ঠাঁই নেই।

কোনমতে ছনু-কালুর হাত থেকে বের হয়ে এসেছে ভোম্বল। এখন সে খুশী। এবার প্রিয়াকে হাতে পাবার পথও একটা হয়েছে। পিসেমশাই-পিসী একটু শক্ত হলেই প্রিয়া ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। তাই খবরটা জানানো দরকার ওদের।

ব্রজবাবু আজ সন্ধ্যায় ক্লাবে মদ্যপান আর অন্য সব কাজের প্ল্যান করার জন্য না গিয়ে সোজা বাড়িতে এসেছে। আজ ওই কাগজগুলো সই করাতে হবে। অবশ্য এটাও ভেবেছে যদি মেয়েটা সই না করে ললিতাকে দিয়েই প্রিয়াঙ্কার নামগুলো লিখিয়ে ফর্ম জমা দেবে। আর ওতেই কাজও হয়ে যাবে তার। সে সব ব্যবস্থাও করে রেখেছে। কিন্তু প্রিয়া তার কথামত সই করবে না, এটা মেনে নিতে পারবে না ব্রজ। তাই এসেছে বাড়িতে, প্রিয়ার উপর চাপ দিয়ে তার প্রতিষ্ঠার পরিচয়টা জানিয়ে দিতে।

কিন্তু প্রিয়ার দেখা নাই। সেই সকালে কলেজে গেছে, এখনও ফেরেনি।

ললিতা বলে—কলেজে নাকি স্পোর্টস—

আর প্রিয়া এখনও ফেরেনি। কি করে সে। একটা মেয়ে দিনরাত বাড়ির বাইরে থাকবে?

ঘড়ে ঢুকছে ভোম্বল। বলে সে,

—এখন প্রিয়া ফিরবে না পিসেমশাই।

—মানে? ব্রজকিশোর চটে ওঠে। শুধায় — কোথায় সে? কি করছে?

এবার ভোম্বল খবরটা দিতে ব্রজ চমকে ওঠে। তার স্মরণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। অন্যায় কাজ যারা করে, তাদের স্মৃতিগুলো খুবই সচেতন। তাই সব ঘটনাগুলোও এবার ব্রজের চোখের সামনে ছবির মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। ভোম্বলের কথায় বলে ব্রজবাবু,

—কি নাম বললি?

—কর্নেল সমরজিৎ। রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার। ওর ওই খালের ধারে একটা প্লাইউড আর কি কারখানা আছে। মাঠের পাশেই সুন্দর বাংলো। ওখানে একটা ছেলে থাকে।

ব্রজকিশোর জানে ওর একমাত্র ছেলেকে সেই-ই শেষ করেছে। তাই বলে,

— ওর নিজের ছেলে?

— না। মনে হয় কোন আত্মীয়ের ছেলে-টেলে হবে বিজয়। প্রিয়া তার সঙ্গেই এখন পার্টিতে নাচগান করছে। দুজনে খুব ভাব।

ব্রজকিশোর এবার চিন্তাতেই পড়ে। কর্নেলকে সে ভালভাবেই জানে। কঠিন ধাতের মানুষ। নেহাৎ প্রমাণ তেমন কিছু পেতে দেয়নি, ব্রজ তাই ওর বাড়ি ঘরের দখলও পেয়েছিল। আর কর্নেল তাকেও ছুঁতে পারেনি। সেইবার পার পেয়ে গেছিল ব্রজকিশোর। কিন্তু বেশ বুঝেছে কর্নেলও বসে নেই। তার পিছনে লেগে আছে। ব্রজকে চরম আঘাত দেবার জন্য। তাই ওই ছেলেটাকে দিয়ে এবার ব্রজের হাত থেকে প্রিয়াকে সরিয়ে নিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যও কেড়ে নিতে চায়।

ব্রজ বলে — ভোম্বল, তুই যে ওখানে গিয়ে এইসব দেখে এসেছিস, একথা প্রিয়াকে জানতেও দিবি না। তুই প্রিয়ার দিকে কড়া নজর রাখ। ছেলেটার সম্বন্ধেও আমাকে সব খবর জানাবি। যা —

ভোম্বল ভিতরে চলে যায়। ললিতা এবার বলে,—তখনই বলেছিলাম,

প্রিয়া সাংঘাতিক মেয়ে। জানা নেই, শোনা নেই একটা বজ্জাত ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে! আমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি হল তো!

ব্রজ পায়চারী করছে। এবার প্রিয়ার সম্বন্ধে কোন পন্থা নেবে, তাই ভাবছে।

প্রিয়া ঢুকছে গুন গুন করে সেই সুরটা ভাঁজতে ভাঁজতে। আজ তার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। এতদিন ধরে সে শুধু হারিয়েছে অনেক কিছু। বাবা-মা চলে গেছেন। তারপর কাকা-কাকীমা এসে গেড়ে বসেছে। তার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

বিজয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে প্রিয়া যেন তার শূন্য নিঃসঙ্গ জীবনে একজন প্রকৃত সঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছিল। ক্রমশঃ দেখেছে কর্নেল সমরজিতকে। ওই হাসি খুশী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির মধ্যে প্রিয়া যেন তার স্বর্গীয় বাবার অস্তিত্বই খুঁজে পেয়েছে। উনিই প্রিয়াকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। জীবনে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সাহস আর চেষ্টা থাকলে লড়াই জেতা যায়। আজ প্রিয়া বিজয়িনী হয়েছে। বিজয়ও জয়ী হয়েছে। দুজনে মিলে যেন নিঃস্ব জীবনের বিরুদ্ধেই লড়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছে আজ। বিজয়ের সঙ্গে আজকের সন্ধ্যাটা নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে কাটিয়েছে প্রিয়া। বিজয় বলে, — ভেঙ্গে পড়ো না প্রিয়া। আমরা দুজনে এই ভাঙ্গনের মাঝেও নতুন করে জীবনকে গড়বো।

প্রিয়াও বিজয়ের সান্নিধ্যে এসে নিজের এক নতুন সত্ত্বার সন্ধান পেয়েছে। কি খুশীতে তার মন ভরে উঠেছে। ফিরেছে সেই খুশীর পশরা নিয়ে।

অবশ্য প্রিয়া একা ফিরলেও ও জানতো না, কর্নেলের দুই চর সেই ছনু আর কালুও তার পিছনে তাকে পাহারা দিয়ে এসেছে। ছনু-কালু এসে দেখে বিশাল বাড়ির মধ্যে প্রিয়া ঢুকে গেল। কালু-ছনু কি কৌতূহল বশে ওর দৃষ্টির বাইরে থেকে বাগানের ওই ড্রইংরুমের জানলার কাছে এসেছে। ওদের জানা দরকার মেয়ের কিছু পরিচয়। তবে কিছু পরিচয় যা পেয়েছে তাতে বুঝেছে এই বাড়ির মেয়েই সে। কিন্তু এবার ব্রজ প্রিয়াকে দেখে গর্জন করে ওঠে।

—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বেহায়ার মত যার তার সঙ্গে নাচগান করতে লজ্জা হয় না। এত অধঃপাতে গেছ তুমি!

এবার কালু চমকে ওঠে, ছনুও। ঘরের ভিতর তখন ব্রজবাবু গর্জন করছে—

—এবার বুঝেছি তোমার ডানা-পালক গজিয়েছে, ওই ডানা-পালক ছেঁটে

দেবে এই ব্রজকিশোর, আমাকে চেননি, প্রায়ই দেখি যখন তখন বের হও। ফেরার কোন ঠিক নেই। খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছ।

প্রিয়া চলে যেতে চায়। ব্রজবাবু গর্জন করে ওঠে,

—দাঁড়াও! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভোম্বল বলছিল—

প্রিয়া দেখছে ভোম্বলকে, তার মনে হয় ভোম্বলই কিছু লাগিয়েছে। কিন্তু প্রিয়া জানেনা যে ভোম্বল কর্নেলের বাংলোতেও গেছে। তাদের নাচগানও দেখেছে।

তবু অনুযোগ করে বলে প্রিয়া,

—বাকীটা ওর কাছেই জেনে নিও। তবে এটা জেনো—

কথাটা শেষ করার আগেই ব্রজ বলে,

— এখন তোমার সব দায়দায়িত্ব আমার। তাই আমার কথা তোমাকে মেনে চলতে হবে। ঢের হয়েছে পড়ার আর দরকার নেই। চাকরী তো আর করতে হবে না। তার চেয়ে বিয়ে থা করে ঘর সংসারই দেখবে।

অবাক হয় প্রিয়া। জীবনে তার স্বপ্ন সে আরও লেখাপড়া করবে। নিজের ব্যবসাপত্রের সব দায়িত্ব নেবে। সে নিজেও ব্যবসার কাজ কর্ম শিখবে। অফিসেও বের হবে।

কিন্তু সেখানেই ঘোর আপত্তি ব্রজকিশোরের। তার সব কুকীর্তির কথা ফাঁস হয়ে যাবে। এখন আবার সে এই কোম্পানীর ছত্রছায়ায় এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসাও শুরু করেছে। অনেক ব্যাপারীর হয়ে মাল আমদানী করে। আর সেই সুবাদে বিদেশে বেআইনী ভাবে বহু কোম্পানীর টাকাও পাচার করে মোটা কমিশনে। এই হাওলার ব্যবসা পুরোপুরি বেআইনী। দেশের সম্পদ অন্যায়ভাবে দেশের বাইরে পাচার করা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব খবর প্রিয়া জেনে গেলে বা পুলিশকে জানালে ব্রজ দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাবে। সর্বস্ব হারাতে হবে তাকে। তাই ব্রজও চায় না প্রিয়া অফিসের কাজের ব্যাপারে কিছু জানুক। তাই সে বলে,

—সুপাত্র ঠিক করেছি।

প্রিয়া বলে — বিয়ে আমি করব না।

— করতেই হবে। পাত্র হিসাবে ভোম্বল খারাপ কিছু নয়।

— ভোম্বল! প্রিয়া চমকে ওঠে। ওই বলদটাকে বিয়ে করতে হবে! ননসেন্স।

ললিতা বলে — ওমা এমন কার্ত্তিকের মত ছেলেকে কিনা বলদ বলছ।

প্রিয়া কথাটা শোনে। বলে,

—বিয়েটা আমার ব্যাপার। এতে কারো নাক গলানো আমি পছন্দ করি না। এসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কি সব কাগজে সই করতে বললেন, ওগুলো পাঠিয়ে দেবেন সই করে দেব। কথাগুলো বলে প্রিয়া ভিতরে চলে গেল।

ললিতা বলে—শুনলে, শুনলে মেয়ের কথা। তোমার ভাইঝি শেষে একটা গোলমাল না বাধায়। ভোম্বলকে বলে কিনা বলদ। ওমা!

প্রিয়া যে কাগজগুলোতে সই করে দেবে আপাততঃ এতেই নিমরাজী হয়েছে ব্রজ। বিরাট টাকার ব্যাপার। এটা পকেটে আসুক তারপর ওই বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে পাড়বে ব্রজ। ব্রজ বলে ললিতাকে, —তুমি মাথা গরম করো না। প্রথমে একটু চেল্লাবে তারপর ক্রমশ পথে ওকে আনবোই। ভেবো না। আর ভোম্বল তুইও চেষ্টা করে যা। চটাসনে ওকে। যে গরু দুধ দেয় তার ঠাট সইতে হয়, বুঝলি।

ভোম্বলও এখন স্বপ্ন দেখে। তার পিসেমশাইয়ের কথায় বলে, — তাই হবে পিসা। প্রিয়াকে হাতে আনবোই।

বাগানে অন্ধকারে ছনু-কালুও দেখছে শুনছে সব। ছনু বলে,

—মেমসাহেবের খুব বিপদ রে কালু। শালা ব্রজবাবু সব কিছুই দখল করতে চায় মাত্র। এত পেয়েও খুশী নয়।

—ওই কুমড়ো পটাশের সঙ্গে বিয়ে দে মেমসাহেবের সব কিছু হাতে আনতে চায়।

কালু গম্ভীর ভাবে বলে, — হুঁ! আমরা সিটকে চোর। আর এই বড়লোক ব্রজবাবু শালা চোরের বাপ — ডাকাত। এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নে বলে—দেবো একদিন শালা চোরের উপর বাটপাড়ি করে।

বিরাট বাড়ি এসব বাড়িতে অফিস ঘরও থাকে। আর এখন সেখানে দু-নম্বরী কাঁচা টাকাও থাকে লাখ দশেক। ওসব টাকা থাকে হিসাবের বাইরে। মোটা টাকা, সেসব টাকা লুটতে পারলে পুলিশের হাঙ্গামাও কম হয়। কারণ দুনম্বরী টাকা নিয়ে কেস কাবারিও করে না।

ছনু বলে — সত্যিই তুই গুরু রে কালু। ঘা মারতে পারলে মোটা আমদানী হবে। চল ঘোতঘাতগুলো দেখে নিই এ বাড়ির।

কালু বলে — তাই দ্যাখ, তারপর এক ঢিলে দুই পাখীই মারা যাবে।

ছায়ামূর্তি দুটো বিশাল বাড়ির ফাঁক ফোকর বের হবার পথগুলো সরজমিনে দেখতে থাকে। ওদিকে অফিস ঘরটাও নজরে পড়ে। একটা জানালা খোলা। তার মধ্যে দিয়ে ঘরটাকে দেখার চেষ্টাও করে। গেটে দারোয়ানকে দেখে কালু বলে,

—পিছনে বাগানের দিকে চল।

উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। একটা গাছের ডাল বেয়ে ওরা পাঁচিলের ওপারে এসে পৌছাঁয়। তারপর লাফ দিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে পড়ে। পিছনের পথে সরে যায়। এদিকটা বেশ নির্জন ছায়া অন্ধকারময়।

কর্নেল সাহেব প্রিয়াকে এই কদিন দেখেছেন। অবশ্য তার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। মেয়েটিকে নিজে দেখেছেন। শান্ত ভদ্র মেয়ে। ওর জীবনে একটা দুঃখ হতাশা বয়ে গেছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও সেই বঞ্চনার বেদনা প্রিয়ার কথার সুরে ফুটে উঠতো সেটা নজর এড়াতো না কর্নেলের। সমরজিৎ দেখেছে মানুষের জীবনে একটা বেদনা শূন্যতা আছেই। সেটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম। তাই বিজয় ও প্রিয়াকে ভালো লাগে কর্নেলের। তারা জীবনের সমস্ত পরাজয়কে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে চায়।

ছনু-কালু কর্নেল সাহেবের বিশ্বস্ত অনুচর। আজ ছনু-কালু ওই মেমসাহেবের বাড়ি অবধি গেছল। ওকে পাহারা দিয়ে আর সেখানে গিয়ে যা দেখেছে শুনেছে সেগুলো বড় সাহেবকে জানানো জরুরী।

কর্নেল সাহেব একটু বেশী রাত অবধি ব্যবসার কাজ কর্ম, ব্যবসাপত্র দেখেন, নিজেও কিছু পড়াশোনা করেন। কর্নেল সাহেব রাতের গভীরে দুই মূর্তিমানকে দেখে চাইলেন।

—তোরা?

ছনু কথা কম বলে। কালুই বেশী চালু, তাই সে বলে,

—স্যার! মেমসাহেবের বাড়িতে খুব নকরা হয়ে গেছে। ওর চাচা বহুৎ বড়া রইস আদমী, বহুৎ বড়া মকান। ওর চাচা ব্রজকিশোরবাবু মেমসাহেবের কারখানা দেখাশোনা করে।

সমরজিৎ-এর কাছে ঐ নামটা খুবই চেনা, তাই সে বলে

— কি নাম বললি?

— উতো বললো ব্রজকিশোরবাবু। বহুৎ বড়া আদমী মালুম হলো।

— ব্রজকিশোর। কর্নেলের চোখের সামনে এক ব্রজকিশোর-এর ছবি ফুটে ওঠে। ধূর্ত নিষ্ঠুর শয়তানের সেই মুখটা সে ভোলেনি। ওই ব্রজকিশোরের জন্যই কর্নেলের সব হারিয়ে গেছে। তার অন্যায় অত্যাচারের কোন জবাবই দিতে পারেনি আজও। অবশ্য ও সেই ব্রজকিশোর কিনা সেটা জানার দরকার।

কালু বলে—লেকিন ও ব্রজকিশোর বহুৎ খতরনাক আদমী মালুম হলো সাবজী।

—কেন? কর্নেল শুধোন।

কালু বলে—-উ হারামী মেমসাহেবের সব কুছ লুটে নেবার জন্যই ওই ফুলের মত মেমসাহেবকে একটা ইয়া হনুমান মার্কা ছেলে মটুরামের সঙ্গে জোর করে সাদী দিতে চায়।

কর্নেল অবাক হন। সেই ব্রজকিশোরের চেহারার সঙ্গে এই ব্রজকিশোরের মিল আছে কিনা জানেন না। তবে মানসিকতার যে নিবিড় মিল আছে — তা বুঝেছেন।

কালু বলে — হাঁ সাব। তাই তো বললেন — মেমসাহেব যদি ভালো কথায় রাজী না হন তবে জোর জবরদস্তিই সাদী দেবে ইভি বললো। সাবজী- উ হারামী মেমসাহেবের জিন্দগী বরবাদ করে দেবে।

কর্নেল কি ভাবছেন। এ বিষয়ে কিছু খবর নিতে হবে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে। তাই সব জানা দরকার। কর্নেল বলেন— ঠিক আছে। তোরা যা। আর এখন এসব কথা বাইরে কাউকে বলিস না। পরে যা করার ভেবে করতে হবে।

কর্নেল সমরজিৎ এবার ভাবনায় পড়েন। এতদিন ধরে সে-ই অন্যায়কে সহ্য করে এসেছেন। আর সেই লোভী লোকটা বিনা বাধায় সমাজের মাথায় উঠে বসে তার অন্যায় কাজগুলো সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনা চক্রে সমরের জীবনের পরিধিতে আবার সে এসে পড়েছে। বোধ হয় হয়তো এ কোন অদৃশ্য বিধাতারই নির্দেশ। সমরকে এবার এই অন্যায়ের

বিনাশ করতে হবে। একটা ফুলের মত মেয়ের জীবন বরবাদ করে দেবে, তারই জীবনের মতো— এ হতো দেবে না কর্নেল সমরজিৎ।

এরপর ব্রজকিশোর ললিতা দুজনেই সাবধান হয়েছে। প্রিয়াকে কলেজে যেতে হচ্ছে বাড়ির গাড়িতে আর ভোম্বলও থাকে গড়িতে। প্রিয়ার বিশ্রী লাগে ওই ভোম্বলকে। আকাশ-এর দলবল এখন কলেজে চুপচাপ হয়ে গেছে। বিজয় তার দলবলই এবার ছাত্র ইউনিয়নই দখল করেছে। বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে। আকাশের দল এতকাল কলেজে র‍্যাগিং এর নামে ছাত্রদের উপর অত্যাচার করতো। কিন্তু সেদিন বিজয়ই দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। ক্রমশঃ কলেজের সব ছাত্রছাত্রী তার পিছনে আসে।

আকাশ তার দলবলও বিপদের গুরুত্বটা বুঝেছে। কেউ বলে — বিজয়, ওই আকাশ-ভুপেন-ভোম্বলদের ধরে দে ঘা কতক।

বিজয় ওসব করে না। অন্যদেরও করতে দেয় না। আকাশটাও নীরবে সরে পড়ে। ভোম্বল আড়ালে বলে,

— ওই বিজয়কে আমিই টাইট করে দেবো। একটু সময় দে। ভোম্বল এখন কলেজেও প্রিয়াকে চোখে চোখে রাখে।

প্রিয়া সেদিন ক্যানটিকে এসেছে। বিজয়ও দেখেছে প্রিয়া যেন সেই রাতে পার্টির পর থেকে কেমন এড়িয়ে চলে। আগে রোজ সকালে আসতো তাদের বাংলোতে। কদিন আর আসছে না। কর্নেল সমরজিতও সেটা লক্ষ্য করেছিল। ওদের দুজনের জগৎ কিন্তু থামেনি। সমরজিৎ তাই বলেন,

—কি হে বিজয় প্রিয়াকে কদিন দেখছি না।

বিজয়ও ভাবছে কথাটা, কদিন কলেজের ছুটি। দেখার হবার সুযোগও নেই। আর প্রিয়া এখানে আসতো বিজয় তার বাড়ির ঠিকানা জানার আগ্রহও প্রকাশ করেনি।

বিজয় বলে—কে জানে, শরীর খারাপ কিনা!

বিজয়েরও মনে পড়ে প্রিয়ার কথা। কিন্তু দেখা পাবার কোন সুযোগই সে করে রাখেনি। সেদিন কলেজে ওকে দেখেছে। ক্যানটিনের ওদিকের মাঠে গাছের নীচে প্রিয়া বিজয়কে দেখে এগিয়ে আসে।

বিজয় বলে—কদিন দেখাই নেই। কর্নেল সাহেবও তোমার খোঁজ করছিলেন।

প্রিয়া বলে—বাড়ি থেকে আর সকালে বের হতে দেয় না বিজয় কলেজেও আসতে হয়েছে ওই ভোম্বলের পাহারায়। আমার লাইফ ওই কাকাবাবু কাকীমা হেল করে দিতে চায়।

প্রিয়ার কণ্ঠে অসহায় বেদনার সুর ফুটে ওঠে যা বিজয়ের মনকেও স্পর্শ করে।

বিজয় বলে—সেকি!

প্রিয়া বলে—কাকাবাবু কাকীমার কাছে থাকি, বাবা মা কেউ নাই। ওরা যেন দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমায়। তাই আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে আমাকে শেষ করার অধিকার ওদের আছে। ওরা চায় জোর করে আমাকে ওই ভোম্বলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। আমাকে শেষ করে দেবে।

—না - না প্রিয়া। বিজয়ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বলে — এ হতে পারে না।

—কিন্তু কি করবো? প্রতিবাদ করার শক্তি সাহস তো নেই। তাই মুখ বুজে ওদের সব অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

—না প্রিয়া। তুমি এ বিয়েতে মত দিয়ো না। কর্নেল সাহেবের কাছে এসে সব কথা জানাও। উনি অন্যায়কে বরদাস্ত করেন না। এর একটা বিহিত হবেই।

ভোম্বলও ওদিকে আকাশের সঙ্গে গল্প করায় ব্যস্ত ছিল। প্রিয়ার দিকে কড়া নজর রাখতে পারেনি। এবার ভোম্বল হঠাৎ দেখে প্রিয় ধারে কাছে নেই। ভোম্বলও হন্তদন্ত হয়ে বের হয় প্রিয়ার সন্ধানে, এখানে ওখানে খুঁজেও পায়না প্রিয়াকে। ভূপেন-আকাশও বুঝেছে ব্যাপারটা, ওর বলে,

—প্রিয়াকে খুঁজছিস। ওই বিজয়কে দেখলাম প্রিয়ার সঙ্গে জোর গল্প করছে।

—শালা হারামি কোথাকার। ব্যাটা রাস্কেলটাকে আজ দেখিয়ে দোব চলতো।

আকাশও বিজয়কে শিক্ষা দেবার মতো একটা সুযোগ পেয়ে সেটার সদ্ব্যবহার করতে চায়। তাই ওরা তিনজনেই মারমুখী হয়ে এসে পড়েছে আর প্রিয়ার সঙ্গে বিজয়কে নিভৃতে কথা বলতে দেখে ভোম্বল বিজয়ের

কলার ধরে গর্জে ওঠে — কি হচ্ছে কলেজে? এ্যা — প্রেমলীলা। শালা নটবরের প্রেমলীলা ছুটিয়ে দেবো।

অতর্কিতে ভোম্বল বিজয়কে একটা ঘুসিও মেরেছে। আকাশও এই ফাঁকে একটা ঘুসি চালিয়েছে বিজয়ের উপর। প্রিয়াও চমকে ওঠে।

— এ্যাই কি হচ্ছে।

ভোম্বলের ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়েছে বিজয়। ভোম্বল প্রিয়াকে ধরেছে —চলো, চলো ক্লাশে, এসো—

প্রিয়াও রুখে ওঠে, —হাত ছাড়ো! ছাড়ো বলছি—

ভোম্বল গর্জে ওঠে,

—রোয়াব। টেনে নিয়ে যাবো। ভোম্বলকে চেননি।

এর মধ্যে বিজয় উঠে পড়েছে। সে কর্নেল সাহেবের কাছে বক্সিং-এর তালিমও নিয়েছে। এবার ভোম্বলকেই সপাটে একটা ঘুসি মারতে ভোম্বলের চোখের সামনে অন্ধকার নামে। প্রিয়ার হাত ছেড়ে শূন্য পথে কি হাতড়াতে হাতড়াতে সে ছিটকে পড়ে। আকাশ বিজয়ের দিকে একটা ঘুসি চালায়। বিজয় চকিতের মধ্যে পাশে সরে গিয়ে ওর ডানদিকের পাঁজরাতে একটা ঘুসি মাড়তে আকাশও ছিটকে পড়ে ভোম্বলের উপর। বেগতিক দেখে ভূপেন বন্ধুদের ফেলে রেখে সরে পড়ে।

প্রিয়া দেখছে বিজয়কে। বিজয় বলে—ওরা কিছুক্ষণ পড়ে থেকেই উঠবে। একটু ডোজ দিয়েছি মাত্র।

প্রিয়া বলে — এখন কি হবে?

বিজয়ও তা জানে না। তবে বলে,

—কর্নেলের কাছেই এসো। পথ একটা হবেই, প্রিয়া। এত ভেঙে পড়লে চলবে না। তবে যে চোট পেয়েছে ভোম্বল, কদিন বিয়ে করার কথা ভাবতে ভয় পাবে।

ক্লাশ শুরু হয়েছে। ঘন্টা বাজছে ওরাও ক্লাশে চলে যায়। এর মধ্যে কোন রকমে উঠে পড়েছে ভোম্বল। কপালে রক্তপাত হয়নি তবে জায়গাটা ফুলে বড় আবের মত হয়ে গেছে। নাকটাও ফুলে গেছে। আকাশ উঠে বসেছে। তবে তার আঘাতটা বেশী। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেন পাঁজরার হাড়টা ভেঙে গেছে। ভোম্বল তবু গজরাচ্ছে,

—কাকাবাবুকে বলে ওর বিহিত করবোই। প্রিয়ার এতবড় সাহস ওই গুণ্ডাটাকে দিয়ে এই ভাবে মার খাওয়াবে আমাকে। আমি এর শোধ নেবই।

বিজয় উত্তেজনার বশে ভোম্বল-আকাশদের ওইভাবে মেরে বসে। প্রিয়াকে ওইভাবে হেনস্থা করতে দেখে সে ভোম্বলকে মেরেছিল। প্রিয়াও যেন ভোম্বলকে নিজেই শাস্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতকাল পারেনি। আজ বিজয় সেটা করেছে। দেখে বলে প্রিয়া,

—ঠিক করেছ শয়তানটাকে পিটিয়ে।

কিন্তু বিজয় নিজের জীবনকে প্রিয়ার চেয়ে অনেক কাছ থেকে দেখেছে। তাই এর পরিণতি কি হতে পারে সেটাও অনুমান করে বিজয় বলে,

— কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ওতো সাতখানা করে লাগাবে তোমার কাকাবাবুকে।

— লাগাক্। জানো বিজয় এতদিন চুপ করেই ছিলাম। এবার কাকাবাবু কিছু বললে তার প্রতিবাদ করবো। কর্নেল সাহেবের কথাই ঠিক। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে অন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমারই খাবে - আমারই পরবে আমার বাড়ি দখল করে থাকবে আর আমার সর্বনাশ করে পার পাবে এটা আমি মেনে নিতে পারব না।

প্রিয়াও যেন এবার পাশে একজনকে পেয়েছে। তার সাহসেই আজ প্রিয়াও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চায়।

এদিকে ভোম্বল ঝেড়ে ঝুড়ে উঠেছে, আকাশকেও তোলে, আকাশ কাতরাচ্ছে। আর ভূপেন এসে দেখছে ভোম্বলকে। বেশ কিছুক্ষণ দেখে বলে.

—কিরে ভোম্বল! তোর মুখের জিওগ্রাফিই যে বদলে দিয়েছে রে ওই বিজয়। নাকটা বেঁকে গেছে আর কপালে একটা ছোটখাটো আমের আটি ঠেলে উঠেছে। আকাশতো ধনুক বাঁকা হয়ে বেঁকে গেছে।

ভোম্বল জবাব দেয় না। গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। নাকে ঠাণ্ডা জলে ভেজানো রুমাল চেপে ধরে। টনটন করছে। দেখে প্রিয়া নীরবে এসে গাড়িতে বসে। আর ড্রাইভারকে বলে,

— গাড়ি চালাও।'

ড্রাইভার জানে দিদিমণির মেজাজ। সেও গাড়ি ষ্টার্ট করে বের হয়ে যায়।

ওদিকে ভোম্বল একহাতে নাকটিপে ধরে হাঁক পাড়ে,

— আই - এ্যাই আমি এখানে। দাড়াঁও এই ড্রাইভার।

প্রিয়া বলে—চলো।

আজ ভোম্বলকে কলেজের মাঠে ছেলেমেয়েদের সামনে আবর্জনার মত ফেলে রেখে প্রিয়া বের হয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। ভোম্বল ক্রুদ্ধ অপমানিত। বিজয়ের দলের কেউ বলে,

—আবে মোটকা হেঁটে যা। চর্বি তবু কিছু কমবে। গাড়ি চড়ার সখ কেন?

ভোম্বল কোনমতে বের হয়ে গেল। আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে ব্রজবাবু-পিসীমাকে বলে।

বিজয় বলে—যদি তাতে কোন বিপদ হয় প্রিয়া। তুমি একা ওই বাড়িতে—

প্রিয়া বলে—তবু নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রতিবাদ করতেই হবে। আর জানি তোমাকে আর কর্নেল আংকেলকে পাশে পাবোই বিজয়।

প্রিয়া চলে গেছে গাড়ি নিয়ে। বিজয় প্রিয়ার কথাগুলো ভাবছিল। অন্যাদের হাসির শব্দে বিজয় চেয়ে দেখে মোটকা ভোম্বল নাকে রুমাল চাপা দিয়ে প্রিয়ার গাড়ির পিছন পিছন ছুটছে আর নাকি স্বরে প্রিয়ার নাম ধরে চীৎকার করে। প্রিয়া ফিরেও চায়না। ওকে ফেলে রেখেই চলে যায়।

হাঁপাচ্ছে ব্যর্থ অপমানিত ভোম্বল। চারিদিকে হাসির সাড়া ওঠে। ওরা হাসছে। কিন্তু বিজয় জানে এর কতটা প্রভাব পড়বে ওই প্রিয়ার উপর।

ললিতা ভোম্বলের ওই হাল দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। প্রিয়া অবশ্য এসব কিছুই বলেনি। ইদানীং বাড়িতে সে কম কথা বলে। এদের এড়িয়ে নিজের মহলেই থাকে। ভোম্বলকে বসিয়ে পিসীমা ডাক্তারকে ফোন করে। ডাক্তার এসে দেখে শুনে বলে,

—নাকের হাড় ভেঙেছে কিনা এক্সরে করে দেখতে হবে।

ললিতা বলে — এ্যা - বাছার বাঁশীর মত নাক ভেঙে দিয়েছে ওই মেয়েটা তার গুণ্ডাদের দলকে দিয়ে। আসুক তোর পিসেমশাই। আজই একটা বিহিত করবো। ওই মেয়ের তেল মারবো।

ভোম্বল বলে — তাই করো। বিয়েটাই দিয়ে দাও। তারপর দ্যাখো বৌকে কেমন সযুত করি। এখন তো বৌ নয় তাই গায়ে হাত তুলতে পারি না। বৌ হোক তারপর দেখবে মজা।

ওদিকে ব্রজকিশোরবাবু এখন প্রিয়ার সই জাল করে ওই এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসাতে ভালোই রোজগার করছে। তার ওপর কারখানাতেও

এখন ভালো লাভ হচ্ছে। তাই সেসব আসল হিসাব দেখানো যাবে না। শ্রমিকরা তো বোনাস এর দাবী তুলবে। সরকার গলা টিপে ধরে ট্যাক্স আদায় করবে।

ব্রজকিশোর ব্যবসার আসল খবরটা কোনদিনই প্রিয়াকে জানায়নি। বরং মিথ্যাই বলেছে। বলেছে,

—কারখানা লোকসানে চলছে। দাদা পদে পদে ভুল করে গেছেন। আর তার খোসারত দিতে হচ্ছে আমাকে। এত কর্মচারীদের পুষে গেছেন এত এত টাকা দিয়ে। কারখানা প্রডাকসনও কমেছে। তাই ভাবছি কারখানায় আর আমি নিজের টাকা ঢালতে পারবো না। বিক্রী করে দেবো কারখানা।

প্রিয়া চমকে ওঠে—বাবার নিজের হাতের তৈরী কারখানা যা লাভ করেছে এতদিন, আজ তা বিক্রী করে দেবেন?

ব্রজকিশোর বলে — কারখানার জন্য আমার নিজের টাকা চলে যাচ্ছে। তুইও সামলাতে পারবি না। দেনাও জমেছে। ব্যাঙ্কও তাগাদা দিচ্ছে। তাই ভাবছি ওই শেঠ কুলকিপ্রসাদকেই কারখানা বিক্রী করে দেব।

অবশ্য এটা ব্রজকিশোরের একটা চাল। ব্রজকিশোর জানে কারখানার কাগজে কলমে মালিক ছিল তার দাদা আর নরনারায়ণ চৌধুরী। সেই মূল দলিলটাকে ব্রজকিশোর কারখানার লকার থেকে সরিয়ে এনেছে নিজের বাড়ির লকারে। অবশ্য পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ছিল দাদার নামে। তাই কাগজপত্র দেখলে মনে হবে তার দাদাই সব।

ব্রজকিশোর এবার মতলব করেছে ওই কারখানাকে বিক্রী করে একটা ছকই করবে। প্রিয়া সেই বিক্রী দলিলে সই করলে ব্রজকিশোর শেঠ কুলকিপ্রসাদের বেনামীতে নিজেই কারখানাও তার লাগোয়া প্রায় দশবিঘে জমির মালিক হবে। মোটা টাকার সম্পত্তি চলে আসবে তার হাতে। তাই কোম্পানীর আসল লাভের হিসাবপত্র বাইরে প্রকাশ করে না। ওইসব কাগজপত্র ব্রজকিশোর এই বাড়িতে নিজের অফিসের লকারে রাখে। সেই সঙ্গে হাওলার কিছু টাকাও।

ব্রজকিশোর দুটো পথই ভেবে রেখেছে। ওই ভোম্বলকে দিয়ে যদি প্রিয়াকে আটকানো যায় সেইটা হবে নিরাপদ পথ। ভোম্বল প্রিয়াকে লিখিয়ে নিতে পারবে চাপ দিয়ে। নিরাপদে সবই হবে। না হলে ওই কারখানা বিক্রীর

ছকই করতে হবে। তবে প্রিয়া ইদানীং বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই পিছনে কেউ মন্ত্রণা দিচ্ছে না, হয় মেয়েটার পিছনে ওর টাকা কারখানার লোভে তেমন কেউ এসে জুটেছে। এইটাই হয়েছে ব্রজকিশোরের কাছে একটা কঠিন সমস্যা। তাই প্রিয়াকে নজরে রেখেছে। আর প্রেমের জগত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে প্রিয়াকে। ব্রজকিশোর-এর ওই এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসাতেই টাকা ঢেলেছে শেঠ কুলকিপ্রসাদ।

লোকটা খুব কাজের। ব্রজকিশোরের ওই বিল্ডিং ব্যবসার সহকারী সে। কুলকির হাতে বেশ কিছু এলেমদার লোকজন আছে। তারা বিদেশী মাল ডক থেকেই নানাভাবে নিরাপদে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাচার করে। কার জমি বাড়ি দখল করতে হবে ভালো কথায় রাজী না হলে কুলকি তাদের নানা ভাবে বাধ্য করিয়ে জমি লিখে দিতে না পারলে দু-দশদিন পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সেই সব জমির দখল পেয়ে যায় ব্রজকিশোর। কুলকিও তার হিস্যা পেয়ে যায়। ব্রজকিশোর তাই কুলকিকে মাঝে মাঝে ক্লাবে এনে খাতির করে আর নতুন কোন জমির জন্য প্লান করে। আজও ব্রজকিশোর-কুলকি তেমনই শুভ কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বেশ কিছু মাল আসছে। সেসব নিরাপদে পাচার করতে কুলকিকে তাই দরকার। মদের টেবিলে ক্যাবারে নাচের সুরে সুরে ব্রজকিশোরের মাথাটা খেলে ভালো। ওরা সেই আলোচনাতেই ব্যস্ত। ব্রজকিশোর জানেনা যে বাড়িতে প্রিয়া আজ একটা কঠিন সমস্যা তৈরী করেছে। সে এখন এইসব কথাই ভাবছে।

হঠাৎ কুলকি দেখে ওদিকে কর্নেল সমরজিৎ কাকে সঙ্গে নিয়ে হলে ঢুকেছেন। ওই সমরজিৎ কিছুদিন আগে ব্রজকিশোর আর কুলকিকে আদালতে নাস্তানাবুদ করেছে। পুলিশও প্রায়ই হানা দিত তাদের পিছনে। সেই জমি বাড়ির কেসটা নিয়ে ওরা খুবই নাজেহাল হয়েছিল। ব্রজকিশোরের নিখুঁত কাজের জন্যই তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। তবে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছে। ওদের দুজনকে কেউ এত বেশী বেগ দেয়নি। কুলকি বলে,

—ব্রজবাবু, কর্নেল সাব এখানে কেন?

ব্রজও দেখছে, ওই লোকটাকে তারা সিধে করতে পারেনি। ওর উপর তাদের দুজনেরই রাগ আছে। কুলকি বলে,

—ব্যাটা বহুৎ খতরনাক আদমী ব্রজবাবু। ওর থেকে হুশিয়ার থাকবে।

ব্যাটা ফৌজী তোমার ওপর চটে আছে। ও ঠিক তোমাকে কোন না কোন বিপদে ফেলবে।

ব্রজকিশোর হাসে। এখন তার অনেক টাকা। দু-চারজন নেতাও তার হাতের লোক। ব্রজ তাদের মোটা টাকা দেয় মাঝে মাঝে। বলে,

—ছাড়ো তো। ওতো এখন রিটায়ার করেছে। ফৌজী থাকতেই ওকে চোট করেছি। এখন তো তালপাতার সেপাই। কি করবে ও।

কর্নেল তার এক ফৌজী বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল। ওরা দুজনে অবশ্য এদের দেখেনি। ওরা ভিতরে চলে যায়। কুলকি-ব্রজকিশোরের মিটিং অবশ্য চলতে থাকে।

ছনু-কালু কিছুদিন থেকেই প্রিয়া মেমসাহেবের খবর নেবার ছল করে এই বড় বাড়িটার আশপাশে ঘুরেছে। ওদের হাত-পা নিসপিস করছে। ওরা বাড়ির অন্ধি-সন্ধি চিনে ফেলেছে, দেখেছে ব্রজকিশোরের বাড়ির অফিস ঘরটাও। কয়েকটা আলমারী লকারও রয়েছে। কালু বলে,

—শালা তো পাকা দু-নম্বরী মাল ওর আলমারীতে নির্ঘাৎ দু-নম্বরী টাকার রাশ আছে। তাই মজবুত তালা চাবি দিয়ে রাখে।

ছনু আগে কোন তালার কারখানায় কাজ করতো, পাকা কারিগর ছিল সেখানে। শ্রমিক মালিক বিরোধের ফলে আগেই সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে ছনু বেশ কিছুদিন কোন পার্টনারের সঙ্গে তালা খোলার কাজ-ই করতো। তার হাতের কারসাজিতে বহুনামী দামী কোম্পানীর তালা সহজেই খুলে যায়।

কালু বলে—কি হাতরে তোর? হাতের ছোঁয়ায় সব তালা আপসে খুলে যাবে। তবে আমার মনিবের তালাটা কোন শালা কারিগর তৈরী করেছিল জানি না। ওটাকে খুলতেই পারলাম না।

অবশ্য কালুর চেষ্টাতেই ছনুর কাজ হয় কর্নেল সাহেবের কারখানায়। সেই থেকে ওরা দুজনে একসঙ্গেই থাকে। চাকরীর পর ওভারটাইম হিসাবে এই পুরোনো অভ্যাসটাকেই বজায় রেখেছে। কালুর কথায় ছনু বলে,
—তালার জন্য ভাবিস না। ওসব আমার যাদুতে খুলে যাবে।

কালু বলে — তাহলে একদিন ঘা মার। শালা মেমসাহেবের লুটছে সবকিছু ওর কিছু লুটলে পাপ হবে না।

ওরা এবার কথাটা বেশ গুরুত্ব দিয়েই ভাবছে। আর ঠিকও করে ফেলে একবার খেলই দেখাবে, ব্রজকিশোরকে তাদের হাতের খেল। ব্রজকিশোর আজ ক্লাব থেকে বেশ বদমেজাজেই ফিরছে। অবশ্য তার চটে যাবার কারণ ওই কুলকিপ্রসাদ। ব্যাটাকে ব্রজকিশোর তার দলে কাজ দিয়েছিল। কুলকিও ক্রমশঃ কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দরও বাড়িয়েছে। ব্রজকিশোরের হয়ে দু-চারটে খুন খারাপি অপহরণ এসব করেছে। অনেক জায়গা জমিও পেয়েছে ব্রজ এইভাবে। মায় কর্নেলের স্ত্রীর সেই কোটি-টাকার জমি বাড়িও। এবার কুলকিকে নিয়ে আরও বড় ব্যবসাতে নেমেছে। কিন্তু এবার কুলকিপ্রসাদ বলে,

—কাজের জন্য টাকা লিব, আর ওই এক্সপোর্ট কোম্পানীর আধা পার্টনার করতে হবে বস। বহুৎ ঝুঁকির কাজ।

ব্রজ নেশা করলেও মাতাল হয়না। কুলকির কথায় চটে উঠলেও তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। ব্রজ বলে,

—কি বলছ কুলকি? তুমি আমার দোস্ত।

কুলকি বলে—কাজ কারবারের ব্যাপারে দোস্ত নাই বস—পার্টনার করে লিতে হবে। তোমার জন্য এত খতরা কাম করছি। এখনও কর্নেল সাহেব টের পায়নি। ও যদি টের পায় আমিই ওর লেড়কা-বহুকে হটিয়েছি। তোমাকে জায়গার দখল দিয়েছি — উভি আমাকে ছাড়বে না। এখন আর্মস-এর কারবার করছি — জানতে পারলেই খতম করে দেবে আমাকে। ডিফেন্সের বহু খবর পাচার করেছি পাকিস্থানের এজেন্টেদের কাছে।

ব্রজ গর্জে ওঠে — খামোস।

— একদম চুপ কর কুলকি। এসব খবর ঘৃণাক্ষরে প্রকাশ পেলে আমি তো মরবোই তুমি ভি মরবে।

— তাই তো পার্টনার করে লিতে বলছি বস। কুলকি তবু তার দাবী ছাড়বে না।

কিছু করার নেই। ব্রজ জানে কুলকিকে তার চাই। ওই তার হয়ে এসব কাজ করে। ব্রজ বলে,

—ঠিক আছে। এসব কথা এখানে নয়, অফিসে বসে হবে। এসো একদিন।

কোন মতে কুলকিকে মানিয়ে এনেছে। তবে বেশ জানে কুলকি থামার পাত্র

নয়। ব্রজকিশোর বিপদেই পড়েছে, সারা দুনিয়া যেন বেইমানের ভিড়ে ভরে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে চলেছে। আজ একটু বেশী মাল টেনেছে। একটু টলে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে ড্রাইভার ধরে নিয়ে কোনমতে নিয়ে গেল।

বাগানে গাছের আড়ালে ছনু কালু দেখছে ব্রজকিশোরকে। ছনু বলে, — কালু, শালা আউট হয়ে ফিরছে। অফিসে আর যাবে না।

—হুঁ, কালুও ভাবছে তাদের প্ল্যানের কথা।

বাড়িতে-এর মধ্যে ললিতা ভোম্বলও তৈরী ছিল। এর মধ্যে ভোম্বলের নাকে পট্টি বাধতে হয়েছে। নাকটা খুব ব্যাথা। ব্রজকিশোর ঢুকতেই ললিতা ও এবার ফেটে পড়ে,

— দিনরাত ওই ব্যবসা আর পার্টি নিয়ে থাকবে। এদিকে বাড়িতে কি সর্বনাশ হতে চলেছে খবর রাখো? সব কিছু যে বেহাত হয়ে যাবে। পায়ের নীচের মাটি সরে যাবে তা ভেবেছ?

ব্রজকিশোর চমকে ওঠে। ওদিকে কুলকিপ্রসাদ তার কারবারে থাবা মারতে চায়। এদিকে বাড়িতেও কি সব কাণ্ড ঘটেছে শুনে ব্রজকিশোরের মাথায় রক্ত ওঠে, সে বলে,

—কি হল আবার? ভোম্বল একি?

ভোম্বল নাকি স্বরে বলে — এখানে আর থাকা যাবে না পিসেমশাই ওই প্রিয়া আর তার লাভার আমাকে আজ মেরেই ফেলতো। ওদের বাড়াবাড়ি দেখে নিষেধ করতে গেছলাম। তা ওই লাভার একনম্বর গুণ্ডা। এইভাবে মারলো —

ব্রজকিশোর গর্জে ওঠে,

—এ্যা প্রিয়া তাহলে লাভ করছে।

ললিতা বলে — ওর লাভ চললে আমাদের যে পুরো লোকসান হবে গো। ললিতা, ভোম্বলের কাছে প্রিয়ার নতুন কীর্তি কাহিনীর কথা শুনে ব্রজকিশোরের নেশাটাও চড়ে গেছে। ক্লাব থেকেই মেজাজটা বিগড়ে ছিল। নেশার ঘোরে সে এখন কুলকিপ্রসাদকে সকলকেই টাইট করতে চায়। মনে হয় ব্রজকিশোরের যে সারা দুনিয়াই আজ যেন তার শত্রু হয়ে উঠেছে। সেইসব শত্রুকেই শেষ করে তাদের বিষ দাঁত সে ভেঙে দেবে। ব্রজকিশোর গর্জে ওঠে,

—প্রেম করছে বাইরের একটা ছেলের সাথে।

ভোম্বল বলে — হ্যা। অনেকদূর এগিয়েছে, ছেলেটাও একনম্বর শয়তান। ব্রজকিশোর গর্জে ওঠে—সে হারামজাদা থাকে কোথায়? কি নাম?

ভোম্বল বলে — বিজয়। থাকে ওই যে প্লাইউড কারখানা রয়েছে খালের ওদিকে মাঠের ধারে, সেইখানে থাকে কোন কর্নেল সাহেবের বাংলোতে।

ব্রজকিশোর এবার চমকে ওঠে। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য শুধোয়,

—কর্নেল সমরজিৎ সেনের ওখানে?

—হ্যাঁ। ওই খোঁড়া কর্নেলেরই কেউ হবে।

এবার ব্রজও ভাবছে কথাটা। কর্নেল সমরজিৎ তাকে হাজতেই ঢোকাতেই চেয়েছিল তার স্ত্রী ছেলেকে খুনের দায়ে, তার জমিবাড়ি দখল করার দায়ে। কোন মতে বহুৎ খরচা করে বেঁচে গেছে ব্রজ। কিন্তু কর্নেল তাকে শাসিয়েছিল— তোমাকে আমি ছাড়বো না ব্রজকিশোর। এই অন্যায়ের জন্য শাস্তি তোমাকে দেবই। চরম শাস্তি।

সেসব বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা কিন্তু ব্রজকিশোর তা ভোলেনি। আজ তার ঘরের প্রিয়াকেই হাত করে কর্নেল এবার ব্রজকে সেই সর্বনাশের শোধ নিতে চায়। ললিতাও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে।

সে বলে — ওমা ওই লোকটা তো সাংঘাতিক গো। ও ঠিক মতলব করেই প্রিয়াকে সরিয়ে নিতে চায় ওই ছেলেটাকে দিয়ে। প্রিয়া সত্যিই যদি ওই ছেলেটাকে বিয়ে করে। আমাদের যে সর্বনাশ হবে গো।

সেটা ব্রজকিশোরও জানে। তার নেশাটা এখন চড়ে গেছে। সে এখন বাদশা শাহেনশার মত প্রতাপশালী ভাবে নিজেকে। ব্রজ বলে ওঠে,

—নেহি হোগা। প্রিয়ার বিয়ে দেব এই ভোম্বলের সাথেই, আর শোন কালই এই বিয়ে হবে। প্রিয়া-প্রিয়া—

প্রিয়াও কাকাকে ফিরতে দেখে এরপর কি হয় সেটা জানার জন্য ধারে কাছেই ছিল। বারান্দা থেকে সে সব নালিশই শুনেছে। ভোম্বল আর তার পিসীমার। প্রিয়া বুঝেছে ওরা প্রিয়ার সর্বনাশ কবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রজকিশোরের রায়ও শুনেছে সে। তবু ওর চীৎকারে এগিয়ে যায় সে কাকার সামনে।

— কিছু বলবে?

ব্রজ বলে — হ্যা। তৈরী থাকো, কালই তোমার বিয়ে।

— কাল! প্রিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

— হ্যা। আর পাত্র ভালো, তোমার চেনাজানা। কালই শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলতে চাই।

ললিতা ভোম্বলও দেখছে প্রিয়াকে। ওদের মনে হয় এক্ষুনি প্রিয়া ফেটে পড়বে প্রতিবাদে। কিন্তু অবাক হয়। প্রিয়া শান্তস্বরে বলে — তাই হবে।

ব্রজ নিশ্চিন্ত হয় — গুড। যাও! বিশ্রাম করোগে কথাটা মনে থাকে যেন।

প্রিয়া চলে আসে। প্রিয়া দেখেছে ওই লোকটাকে। বুঝেছে এখানে কোন প্রতিবাদ করে ফল হবে না। ওরা জোর করে তাকে এই বিয়েতে রাজী করাবে। সর্বনাশই করবে তার।

এখন তাকে নিজেকেই এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পথ বের করতে হবে। তাই প্রতিবাদ করে ওদের সতর্ক করে দিতে চায় না। তাই প্রিয়া ওদের কথা তখনকার মতো মেনে নিয়েই বের হয়ে যায়।

ললিতা ভোম্বল ভাবেনি যে এত সহজে সে এই বিয়েতে রাজী হয়ে যাবে। ভোম্বল মহাখুশী।

ললিতা তবু বলে—মেয়েটা রাজী হয়ে গেল?

ব্রজকিশোর তার নিজের বীরত্বে নিজেই খুশী হয়েছে। এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে ভাবেনি। সে বলে,

—হবে না? তাহলে এই ব্রজকিশোর কি করতো তা জানো না। সেই সব ভেবেই বাপের সুপুত্রীর মত রাজী হয়েছে। তাহলে কালই রেজিষ্ট্রী করে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

ললিতা বলে — তা করো। তবে বাপু দু'একদিনের মধ্যে হৈচৈ করে বিয়ের পার্টিও দিতে হবে কোন বড় হোটেলে, প্রেসের, টিভির লোকেদেরও আনতে হবে। ব্রজও জানে এই বিয়ের একটা রেকর্ড প্রচার এসব করা দরকার। তাই বলে,

—হবে - হবে। কোন ক্রটিই হবে না। চল রাত হয়েছে, শুতে হবে কাল নানা হাঙ্গামা।

সারা বাড়িটা নিশুতি। ভোম্বলও এখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে প্রিয়া এসেছে তার জীবনে। ওদিকে ব্রজকিশোরও স্বপ্ন দেখছে এবার প্রিয়া-ভোম্বলদের দিয়ে কিভাবে সবকিছু লিখিয়ে নেবে। আর সেই-ই হবে সবকিছুর মালিক।

ঘুমোচ্ছে বাড়ির লোকজনও। ঘুম আসে না প্রিয়ার। তার সামনে আজ বিপদের কালো ছায়া। তার সর্বস্ব হারিয়ে যাবে। কিছুতেই সে তা হতে দেবে না। প্রিয়া হার মানবে না। সে এর মধ্যে একটা ব্যাগে কিছু জামা শাড়ি ব্যাঙ্কের চেকবই বেশকিছু ক্যাশ আর গহনা পুরে তৈরী হয়েছে। সে এবার এই বাড়ি ছেড়ে এদের হাতের বাইরেই চলে যাবে। প্রিয়ার এছাড়া আর কোন পথই নেই। সারা বাড়ি ফাঁকা। তবু গেটের ওদিকে দারোয়ান গুমটিতে বসে গেটবন্ধ করে ঢুলছে। ওদিকে যাওয়া যাবে না। অবশ্য প্রিয়া ওদিকে যাবেও না। এই বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়িটা থেকে পালাবার একটা পথ তার জানা আছে। বাড়ির পিছনদিকে বেশ কিছু বড় গাছ ছায়া অন্ধকার করে রেখেছে জায়গাটা। সেগুলির দু-একটা একেবারে পাঁচিলের গা ঘেঁসে উঠেছে। প্রিয়া ওই পিছন দিকে বের হবার পথটাও চেনে। মাঝে মাঝে তারা ওই ভাবে বেরও হয়েছে। বাড়িটা নিশুতি হতেই প্রিয়া সাধারণ দরজা খুলে বাড়ির বাগানে নেমে আসে। পাঁচিলের দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে ছনু-কালুও আজ রাতেই এ বাড়িতে সেই ব্রজবাবুর অফিসে অপারেশন করার সিদ্ধান্তই নিয়েছে আর সেই মত ছনুও ঢুকেছে বাড়ির ওদিকে একতলায় ব্রজকিশোরের অফিসে। ছনু ছায়ামূর্তির মত ঢুকেছে ব্রজর অফিস ঘরে। দুতিনটে আলমারীতে ব্রজর বহু দু-নম্বরী কাজের কাগজপত্র, ইদানীং বিদেশ থেকে সে নানা অস্ত্রও আমদানী করে জঙ্গীদের কাছে ভালো দামে বিক্রী করে। সেইসব বিদেশী অস্ত্রের চালানপত্রও রয়েছে নানা ফাইলে। আর রয়েছে সেই নন্দকিশোর বাবু আর নরনারায়ণের ওই কারখানার অংশীদারীর মূল দলিলও। খুব দরকারী দলিল, গোপন কাগজপত্র একটা বিদেশী এটাচিতে করে রেখেছে। সেই এটাচির কমবাইন লক-এর কায়দাও অনেক। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু টাকা। অবশ্য বেশী টাকা সে অন্যত্র কোন গোপন জায়গাতে সরিয়ে রাখে।

ছনু তার হাতের যাদুতে আলমারি খুলে বেশ কিছু টাকা পেয়ে খুশী। আর দেখে ওই দামী এটাচিটা। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও অনেক টাকা আছে

তাই ছনু বেশ কিছু টাকা আর ওই এটাচি নিয়ে জানলায় পর্দায় বেঁধে বুঁচকি বেঁধে বের হয়ে পড়ে।

কালু ওদিকে বস্তির পিছন দিকে পাঁচিলের নীচেই গাছের ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। মশাগুলোও তার সন্ধান পেয়ে ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু শব্দ করে চাপড় দিয়ে মারার উপায় নেই। কেউ তার অস্তিত্বের খবর পেয়ে যাবে। পাঁচিল ঘেঁসে দাড়িয়ে আছে কালু। উঁচু প্রাচীর। ওদিকে বাড়ির ভিতরে বাগানের ডালটা বাইরে দিকে এসেছে। ছনু ভিতর থেকে কাজ শেষ করে মাল নিয়ে ওই গাছের ডাল বেয়ে নামবে। আর যাতে ওর পড়ার শব্দ না হয়। কালু ওই ডালের নীচে গিয়ে পজিশন নেবে আর ছনু ওর ঘাড়ে চেপে নিঃশব্দে মাটিতে নামবে। তারপর দুজনে কেটে পড়বে।

কালু উসখুস করছে আর কান পেতে রয়েছে। হঠাৎ ওই পাঁচিলের উপর থেকে কে কালুর ঘাড়েই এসে পড়ে। কালুও তার অস্তিত্ব অনুভব করে ওর কাঁধে। আর ছনু পড়ে যেতে পারে মনে করে ওর হাতটাও চেপে ধরে চমকে ওঠে। কালু বলে — কিরে ছনু। শালা তোর কাঠ কাঠ চিমড়ে হাত পা এমন নরম নরম ঠেকছে।

ছনুরূপে কাঁধে চাপা মূর্তিটাও এবার নেমেছে ওর কাধ থেকে আর পথের আবছা আলোয় কালু সেই মূর্তিকে দেখে চমকে ওঠে — মেমসাহেব আপনি!

প্রিয়া ইশারায় কালুকে চুপ করতে বলে জানায় সেও বের হয়েছে ওই বাড়ি থেকে।

— এতরাতে যাবেন কোথায়? কালুও অবাক হয়।

প্রিয়া বলে — বিজয়বাবুর ওখানে। কর্নেল সাহেবের বাংলোতে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে। এতরাতে এতটা পথ যেতে হতো। চলো—

প্রিয়াকে এখুনি পালাতে হবে। ধরা পড়ে গেলে আর বাঁচার পথ থাকবে না। ওদিকে ছনু তখনও ফেরেনি। কালু অবশ্য ওদের এখানে আসার কারণটা জানাতেও পারে না।

প্রিয়া বলে—কি হল? চলো—

কালুও জানে ছনু এলেমদার লোক সে একাই একশো। সে ঠিক চলে আসবে। তাই মেমসাহেবকে নিয়েই এগিয়ে চলে কালু।

ছনু অবশ্য কাজ শেষ করে মালপত্র নিয়ে পাঁচিল টপকে এদিকে পড়ে কালুর পাত্তাও পায় না। ছনু বুঝেছে হয়তো লোকজন কেউ এসেছিল তাই কালু গা ঢাকা দিয়েছে। সেও আর দেরী না করে ওখান থেকে সরে পড়ে মালপত্র নিয়ে তাদের ডেরার দিকে।

বিজয় রাতে ঘুমোচ্ছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ, এদিকটাতে এমনিতে লোকজন নেই। এটা এদেরই এলাকা। তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে জেগে ওঠে বিজয়। এতরাতে কে ডাকবে তাকে। কে জানে হয়তো কর্নেল সাহেবই ডাকছেন কোন কাজে। দরজা খুলে বিজয় দেখে প্রিয়া। হাতে একটা ব্যাগ চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। এতখানি পথ এসে হাঁপাচ্ছে সে।

বিজয়ও অবাক হয়। সত্যি না স্বপ্ন দেখছে সে বুঝতে পারে না। বিজয় দেখছে প্রিয়াকে। শুধোয় সে,

—কি ব্যাপার। তুমি এত রাতে এখানে?

প্রিয়া ক্লান্তিতে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। সে বলে,

—আমার খুব বিপদ বিজয়। তাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। না হলে ওই কাকাবাবু কাকীমা কালই জোর করে ভোম্বলের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। ওরা আমার সর্বনাশ করে দেবে। যা হয় কিছু করো বিজয়। আমাকে বাঁচাও। এসময় তোমার কথা মনে হতে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।

বিজয় অবাক হয়। সে জানে তার পায়ের নীচে মাটি নেই। কোন আশ্রয়ই নেই। কর্নেলের দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়েছে। পড়ার সুযোগ পেয়েছে। বিজয় বলে,

—আমার কাছে এসেছো প্রিয়া। কিন্তু আমি - আমি তো অসহায়, অন্যের দয়ায় এখানে রয়েছি। আমি কি করতে পারি তোমার জন্য। আমার তো কোন সাধ্যই নেই।

প্রিয়া বলে—পথ একটা কিছু বের করতেই হবে বিজয়। তোমার কাছে ঠাঁই না পেলে আমার নিজেকে শেষ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এতবড় দুনিয়ায় আজ সব থেকেও আমার কিছুই নেই। আমি নিঃসঙ্গ অসহায় একা। সামনে এই সর্বনাশের ছায়া।

বিজয় বলে — প্রিয়া আমি যে একান্ত অসহায়। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। দেখবে একটা পথ হবেই।

না! আমার মরা ছাড়া আর পথ নেই বিজয়।

— না। হঠাৎ কার কঠিন কণ্ঠস্বরে চাইল ওরা। উপরের সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ তুলে নামছেন কর্নেল। তিনি দোতলার বারান্দাতে রাত অবধি পড়ছিলেন। দেখেছেন প্রিয়াকে কালুর সঙ্গে আসতে। একটু অবাক হন। তারপর প্রিয়াকে বিজয়ের সঙ্গে এই সমস্ত কথাগুলোও বলতে শুনেছেন। এর আগেই প্রিয়ার বাড়ির সমস্যার কিছু কথা শুনেছেন। সুন্দর মেয়েটার বাবা-মা কেউ নেই তবু জীবনে প্রেম স্বপ্ন আছে বিজয়কে ঘিরে।

কিন্তু ওর এক দুঁদে কাকাবাবু আর কাকীমা যার আশ্রয়ে থাকে তারই মেয়েটার চরম সর্বনাশ করার জন্যই একটা বাজে ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চায়। প্রিয়া বলে, সেসব কথা।

কর্নেলও জানেন বিজয়-প্রিয়া দুজনে দুজনকে ভালোবাসে। প্রিয়াও স্বপ্ন দেখে বিজয়কে নিয়ে। আজ প্রিয়ার চরম বিপদ তাই বিজয়ের কাছে ছুটে এসেছে। কিন্তু বিজয়ের মুখে অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠেছে। কর্নেলকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা। কর্নেল বলেন,

—কোন ভয় নেই প্রিয়া, বিজয়—

বিজয় বলে—আমি কি করতে পারি স্যার।

—অনেক কিছু। বিজয়। জীবনে প্রেম একবারই আসে একজনকে ঘিরে এর স্পর্শ সকলে পায় না। তুমি পেয়ে হারাবে তবু সেই প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য কিছুই করবে না। এত ভীরু তুমি!

বিজয় চাইল। সে বলে—স্যার!

—নো স্যার! বিজয় প্রিয়াকে তুমি ফিরিয়ে দিতে পারো না। এই বিপদের সময়।

— কিন্তু কি করতে পারি স্যার। ওর কাকা বিরাট বড়লোক।

বিজয়ের কথায় প্রিয়া বলে—আমার বাবা মারা যাবার পর বাবার বাড়ি-ব্যবসা কারখানা সব ওই লোকটাই দখল করেছে আমাকে বঞ্চিত করে। এবার বিয়ের নাটক করে আইনত সবই কেড়ে নিতে চায়।

কর্নেল শুনছে প্রিয়ার কথা। সেই লোভী শয়তান তারও বাড়ি লুট করেছিল

তার স্ত্রী সন্তানকে শেষ করে। আজ প্রিয়াও সেই চক্রান্তের শিকার হয়েছে। কর্নেল যেন আজ ওকে তারই মত ঘা খাওয়া একজন বলে ভাবে। ওদের মধ্যে কোথায় যেন নিবিড় সাদৃশ রয়েছে।

বিজয়ও শুনেছে প্রিয়ার কথা। তারও সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে তার জ্ঞাতিরা। বিজয়কেও তারা নিঃস্ব করে গ্রাম ছাড়াতে বাধ্য করেছে। ওরা সকলেই একটা শ্রেণীর কঠিন শোষণ আর অত্যাচারের শিকার।

কর্নেল বলে—বিজয়! প্রিয়া এখানেই থাকবে। তারপর ভেবেচিন্তে পথ একটা বের করতেই হবে। ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বিজয় বলে—ওর কাকা যদি ঝামেলা করে।

প্রিয়া বলে—ওদের বিশ্বাস নেই স্যার।

কর্নেল বলেন—অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি জীবনভোর। বাকী দিনগুলো তাই করবো। প্রতিবাদও করো তাতে যা হয় হোক। আর বিজয় এই কাজে তোমাকেও দরকার হবে। আশাকরি প্রিয়ার এই বিপদে তুমি নিশ্চয়ই ওর পাশে দাঁড়াবার সাহস পাবে, ইয়ং ম্যান।

বিজয়ও মনে মনে জোর পায়। সেও খুশী হয়েছে কর্নেলের কথায়। এই সিদ্ধান্তে বিজয় বলে—নিশ্চয়ই স্যার।

—ভেরি গুড। প্রিয়া তুমি দোতলার ওই দিককার ঘরে থাকবে। একটু অসুবিধা হবে প্রথম প্রথম।

প্রিয়া বলে—না আংকেল। আমার কোন অসুবিধা হবে না। তবে আপনাদেরই অসুবিধায় ফেললাম কিনা ভাবছি।

কর্নেল হাসেন—দ্যাটস ওকে। চলো তোমার ঘর দেখিয়ে দিইগে। রাত হয়েছে শুয়ে পড়োগে। কাল কথা হবে।

কর্নেল দেখছে ছনু আর কালুকে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে ওরা দুজনে বাংলোর বাইরে উসখুস করছে। কর্নেল জানেন ওদের ব্যাপার, দু-একটা জরুরী খবর আনে ওরা। হয়তো তেমন কোন খবরই এনেছে।

কর্নেল শুধোন—কি ব্যাপার কালু?

কালু-ছনু দুজনেই মাথা চুলকোয় নিরীহ কোন প্রাণীর মত। বলে—একটা জরুরী বাত ছিল সাহেব?

—এতরাতে কি কথা রে?

কালু বলে—থোড়া আপনার অফিস ঘরে চলেন ওখানেই বাতচিত হবে

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বলেন — তোদের দুটোকে এবার তাড়াতেই হবে না হলে শান্তি পাবো না। চল শুনি কি বলবি। তারপর তোদের বিহিত করবো। কোথায় কি অপকর্ম করে আসবি আর সামলাতে হবে আমাকে ওই মেমসাহেবকে সঙ্গে করে আনলি ওকে পেলি কোথায়?

কালু বলে — উ-সবই বলবে স্যার। ছনু ভি কিছু বলবে।

কর্নেল অফিস ঘরে এসে দেখেন এর মধ্যে ছনু সেই দামী এটাচিটা কৌশলে করে খুলেছে। আর তাতে বিশেষ টাকাকড়ি নেই। রয়েছে অনেক দামী ষ্ট্যাম্প পেপার নানা দলিল। আর বিদেশী কোন কোম্পানীর বেশ কয়েকাট চালান ভাউচার, কয়েকটা বিদেশী অস্ত্রের ছবি। তাদের কার্যকারিতার ফর্দ।

ওসব চেনেন কর্নেল। মিলিটারীতে থাকতে ওইসব বিদেশী এ্যান্টি রাইফেল এস এল আর, লাইট মেসিন গানও দেখেছেন, আর আজ অবাক হল—যে সেইসব অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বেআইনী ভাবে এদেশে আমদানী করেছে বেশ কিছু লোক আর গোপনে নানা জঙ্গী সংগঠন কিনছে এইসব অস্ত্র কোটি টাকার গোপন কারবারের নমুনা ওই সিটকে চোর ছনু আর কালু ফাঁস করেছে। কর্নেল চমকে ওঠেন।

—এসব কোথায় পেলি রে। এ যে ডাকাতের ওপর বাটপাড়ি করেছিস এত দলিলপত্র।

ছনু বলে — একটা পার্টির ঘরের আলমারী থেকে পেয়েছি হুজুর। আরও বহুৎ ভি আছে মালুম।

আর টাকাকড়ি।

ছনু বলে—নেহি সাব। উসব করেনি—ওদের ইয়ে বাড়ির বাইরে দুশর কেউ লিয়ে কুছু না পেয়ে ফেলে গেছে। হামি শোচলো কাম কাজের মাল তাই এনেছি। চোরি করিনি সাব—

কালুও সাধুপুরুষ সাজার এমন মৌকা হারাতে রাজী নয়। সে বলে—হ্যা সাব। রাম কসম। ইসব চোরিকা মাল নয়। কাগজ লিয়ে হামলোগ কি করবে। কোই চোরি করে ইসব।

কর্নেল বলেন—এখন সব গুছিয়ে ভিতরে রেখে দেরাজে পুরে রাখ। পরে দেখা যাবে কার কি আছে ওতে।

ওরাও দাগমুক্ত হয়ে ওসব তুলে রেখে শুতে চলে যায়। তখনও রাত রয়েছে।

বড় বাড়ির লোকেদের ঘুম ভাঙে একটু দেরীতে। ভোম্বল এতদিন পর আজ রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। ব্রজকিশোর অবশ্য এমনিতেই ওঠে বেলাতেই। বিছানায় বসেই চায়ের আগে দু'এক পেগ হুইস্কি নিট গিলে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে বসেছে। হঠাৎ ললিতার চীৎকারে তার তন্দ্রা ভাঙে।

— কি হলো?

— ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে। প্রিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না।

— সে কি! গেল কোথায়? ব্রজও চমকে ওঠে।

হাঁকডাক শুনে ভোম্বলও লাফ দিয়ে উঠেছে। ললিতা বলে,

—ওরে হতভাগা কুম্ভকর্ণ নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছ। এদিকে বাড়ি থেকে মেয়েটা উবে গেল। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না।

ব্রজকিশোরও বিপদের গুরুত্ব বুঝে এবার ধড়ফড় করে উছে বসে। এদিকে বাড়ির কাজের মেয়েরা বেয়ারার দলও এদিক ওদিক বাগানে খুঁজছে। কোথাও পাত্তা নেই প্রিয়ার।

বস্তির কাজের লোক একজন দেখে পাঁচিলের মাঠের একটা আমগাছের বেশকিছু ডালপালা ভাঙা। ওই গাছের ডালটাই পাঁচিলের বাইরে রাস্তার দিকে চলে গেছে। পিসীমাও দেখেছে ওটা। বলে,

—ওমা দ্যাখো কাণ্ড, ওই ডাল বেয়ে কেউ এসেছিল ভিতরে। না হলে এতসব ডালপালা ভেঙে পড়ে থাকবে কেন?

ভোম্বলও চমকে ওঠে। ললিতা বলে — ওগো পুলিশকে খবর দাও।

ব্রজকিশোর পুলিশকে ঘাটাতে চায় না। সে জানে প্রিয়া এখন সাবালিকা, কলেজে পড়ে। তার উপরেও নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে সে। জেনে শুনে প্ল্যান করেই পালিয়েছে প্রিয়া। আর তার পিছনে কেউ নিশ্চয়ই সাহস দেবার মত আছে। প্রিয়াই পুলিশকে তার নামে কিছু বললে ব্রজেরই বিপদ হতে পারে। তাই ব্রজ বলে — গেল কোথায়?

ললিতা বলে — তাইতো ভাবছি। রাত দুপুরে মেয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। কেউ জানতে পারলো না। বংশের মুখে এইভাবে চুনকালি দিল।

ভোম্বল বলে — এক জায়গাতে যেতে পারে। সেখানে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে তাকে।

ললিতা বলে — তাই যাও বাপু।

ব্রজ বলে — তাই যাবো। আর সেখানে থাকলে ওর চুলের মুঠি ধরে তুলে এনে ওর বিয়ে থা দিয়ে এই বাড়িতে আটকে রেখে দেব। আজন্ম যেন কোনদিন বাইরে বের হতে না পারে। ডানা পালক জন্মের মত ছেটে দেব ওর।

ব্রজ তাই এবার তৈরী হয়েই এসেছে। ইদানীং ওই সব দু-নম্বরী ব্যবসা শুরু করার পর থেকে ব্রজকিশোর-এর সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন ঘোরে। এসব ব্যাপারের ব্যাপারীদের একটু সাবধানে থাকতে হয়। অন্যদলও আছে তারা চায় না এই লাভজনক কারবারে আর কেউ আসুক। এলে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাও হয়। তাই শোনা যায় মাঝে মাঝে দুই দলের মধ্যে গুলি বিনিময়-খুনখারাপির কথা। তাই ব্রজকিশোরও তার জনকয়েক বাছাইকরা দেহরক্ষীও রাখে। তারা অনায়াসে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে। নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করতে পারে। তেমন কিছু দলবল নিয়ে ব্রজকিশোর চলেছে ভোম্বলের সঙ্গে। তিনচারটে গাড়িও রয়েছে প্রিয়ার খোঁজে।

কর্নেল সমরজিৎ নিজে একজন প্রখ্যাত যুদ্ধবিদ। তাই প্রিয়া এখানে আসার পরই তাকে আশ্রয় দিয়েই পরবর্তী রণকৌশলও ঠিক করে রেখেছিলেন। প্রিয়ার পরিচয়ও জেনেছেন। তিনি এতদিন ওর সঠিক পরিচয় জানতেন না। তবে মেয়েটিকে তার খুব ভালো লেগেছিল। ওর সঙ্গে বিজয়ের ঘনিষ্ঠতাকে তিনিও সমর্থন করতেন। আজ প্রিয়ার বিপদের কথা জানতে গিয়ে জেনেছেন ওর পরিচয় আর ব্রজকিশোর যে হিসাব করে প্রিয়াকেও শেষ করে তার সর্বস্ব দখল করতে চায় সেটা জেনে ব্রজকিশোবের উপর কর্নেলের রাগটা আরও বেড়ে ওঠে। লোকটা যেন শুধুমাত্র অন্যাদের সর্বনাশ করার অধিকার নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে। বহুজনের বহু সর্বনাশ করেছে ওই শয়তান। এবার কর্নেলও ব্রজকিশোরকে উচিত শিক্ষা দেবার সুযোগই যেন পেয়েছে।

কর্নেলও এবার লড়াই-এর জন্য তৈরী হয়েছেন। সকালে বাংলোর বাগানে চায়ের আসর বসেছে। অবশ্য কর্নেল তার কারখানার লোকজনদেরও সতর্ক করে রেখেছে আর ছনু-কালুও নজর রেখেছে চারিদিকে।

ওরাই এসে খবর দেয় মোড়ের ওদিকে একজন ভদ্রলোক সঙ্গে সেই মোটা ভোম্বলবাবুও রয়েছে। বেশকিছু লোকজন নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আপনার বাংলোর খোঁজ করছেন। কর্নেল অবশ্য এমন আক্রমণের কথা ভেবেই রেখেছিলেন। প্রিয়াও ঘাবড়ে গেছে, বিজয়ও।

প্রিয়া বলে — কাকাবাবু লোকজন নিয়ে এসেছে, ও সাংঘাতিক লোক। ওর দলবলও নাকি ভীষণ মারকুটে।

কর্নেল বলেন — প্রিয়া কোন ভয় নেই। তুমি উপরের ঘরে চলে যাও। বের হবে না এখন আমি ওদের দেখছি।

প্রিয়া চলে যায় উপরে। ভয় পেয়েছে সে। কর্নেল বলে,

—ছনু কারখানার ছেলেদের বলবে যেন তৈরী থাকে। কালু গিয়ে খবর দিল তারা যেন বের হয়ে আসে। তারপর অবস্থা মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

এর মধ্যে ব্রজকিশোরও এসে পড়ে তার দলবল নিয়ে। বিজয়ও রয়েছে। ভোম্বল দেখছে বিজয়কে। ভোম্বল বলে,

—কাকাবাবু ওই সেই ছেলেটা। ওই যে প্রিয়ার লাভার শালা নটবর। ওই সেদিন আমার নাক ফাটিয়েছিল।

ব্রজর তখন ওদিকে নজর নেই। ওর নজর তখন কর্নেলের দিকে, এখনও নিটোল স্বাস্থ্য — পাশে রাখা একটা রাইফেল আর দুটো বিশাল এ্যালসেশিয়ান জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে আর ঠাণ্ডা চাহনিতে যেন ব্রজকিশোরকে দেখছে। ব্রজকিশোরকে দেখছে কর্নেল সাহেবে। ওকে আগেও দেখেছে। দুজনেই দুজনকে চেনে। আগের লড়াই-এ অবশ্য ব্রজকিশোরই জিতেছিল। অনেকদিন পর আবার দুজনে মুখোমুখি হয়েছে। কর্নেল চাইলেন,

— কি চাই এখানে?

এবার ব্রজ ফেটে পড়ে। কঠিন কণ্ঠে বলে — প্রিয়াকে এখানেই রেখেছেন। তাকে বের করে দিন।

সমরজিৎ অবাক হবার ভান করে।

— প্রিয়া! আপনার প্রিয়া কে তাই জানি না। তাকে লুকিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

— ন্যাকামি হচ্ছে। শুনুন কর্নেল, এর আগেও আপনি আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছেন, পুলিশ রেকর্ডেও তা আছে, মিথ্যা মামলাও করেছেন।

কর্নেল ওই লোকটার কথা শুনছেন। মানুষ যে এতবড় মিথ্যাবাদী হতে পারে তা জানা ছিল না। নিজে চরম অন্যায় করে আজও সেটার জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না। কর্নেল বলেন,

—ওসব কথা থাক। প্রিয়া এখানে আসেনি — আর বিনা অনুমতিতে আমার এলাকায় লোকজন নিয়ে ঢুকেছেন—আমাকে শাসাছেন।

ব্রজ বলে — শাসাবো না? এই ছেলেটাকে দিয়ে আমারই ভোম্বলকে মারধর করেছেন। একে প্রিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে একটা নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করতে চান। আমার বংশের সুনাম বিপন্ন করতে চান। আপনি এইসব অপরাধের নাটের গুরু। আমার ভাইয়ের মেয়ের জীবনটাও বরবাদ করবে এ হতে দেবো না। বের করুন তাকে।

কর্নেল বলে — প্রিয়া এখানে আসেনি। আপনি চলে যান এখান থেকে না হলে ...

ব্রজ গর্জে ওঠে — না হলে কি করতে পারি সেটাও দেখিয়ে দেবো। এ্যাই কুলটি-পল্টন।

ওর দলের দু-চারজন এগিয়ে আসে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় তারা। এবার ব্রজের হুকুম পেলেই এ্যাকশান শুরু করবে। কিন্তু ব্রজ দেখে ওদিকে কারখানা থেকে বেশ কিছু শ্রমিক হাতে নানা সাইজের রড নিয়ে ওদের ঘিরে ফেলেছে। কর্নেল বলে,

—কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিলে আপনার কুলকির দলকেই শেষ করে দেবে। আর আপনিও এখানে এসে আমাকে এ্যাটাক করেছেন। এটাও জানবে পুলিশ।

ব্রজ এবার একটু ঘাবড়ে গেছে। তবু বলে সে — বের করে দিন নাহলে—

এবার কর্নেলও রাইফেলটা হাতে নিয়েছে। খট্ করে চেম্বারটা খুলে দিতে দেখা যায় তাতে কার্তুজ লোড করা আছে। কর্নেল বলেন, এটা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে আর প্রয়োজন হলে এটা চালাবার অনুমতিও আমার

আছে। একসঙ্গে দুটো গুলি বের হবে পর পর ব্রজবাবু। আমার নিশানা আজ অবধি ভুল হয়নি, তাই বলছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যান না গেলে ছনু কুকুর দুটোকে খুলে দিবি। তারপর কাজ না হলে আমিই গুলি চালাবো। — ওয়ান।

কর্নেলের গলার স্বরে সেই যুদ্ধক্ষেত্রের রণধ্বনি শোনা যেতে থাকে।

ব্রজকিশোর এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে পিছু হটতে বাধ্য হয় দলবল নিয়ে। তবু শাসায়।

— এখন যাচ্ছি। আমি পুলিশ নিয়ে আসবো। তারপর দেখা যাবে কে কাকে শাসায়।

ওরা ফিরে যায়। কিন্তু এবার বিজয় বলে — স্যার।

এবার কর্নেল চাইলেন। ওরা চলে যেতে প্রিয়াও নেমে এসেছে। দোতলার জানালার ফাঁক থেকে সে দেখেছে ব্রজকিশোরদের। এবার প্রিয়াও ভয় পায়।

বিজয় বলে — স্যার! এরা এখন ফিরে গেল কিন্তু এবার থানা পুলিশে যাবে।

প্রিয়া বলে — কাকার আমাকে খুব দরকার। তাই সে আমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য সবকিছুই করবে। ওকে বিশ্বাস নেই।

কর্নেলও চেনে ব্রজকিশোরকে। সে যে পুলিশ নিয়ে আসবে তা নিশ্চিত। তাই ওদের সরিয়ে দিতে হবে আপাতত এখান থেকে। কর্নেল বলে,

—তা সত্যি। তাই দিন কয়েকের জন্য তোমাদের যদি বাইরে কোথাও পাঠাতে পারতাম ভালো হতো। কিন্তু যাওয়া যাবে কোথায়? নিজেই কথাটা ভাবছেন কর্নেল।

বিজয় বলে — আমার বাবার এক বন্ধু ছিলেন মিঃ রায় — দেশের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। তবে নিজের বিরাট চা বাগান আছে। বাবারও একটা চা-বাগান ছিল পাশেই। নেপাল বর্ডারের দিকে। মিরিক থেকে ভিতরে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ওখানে গেছলাম। তিনি প্রায়-ই যেতে বলতেন — আর যাওয়া হয়নি। ওঁর বিরাট বাংলো খালিই পড়ে থাকে। যদি ওখানে চলে যাই দিন কয়েকের জন্য। সবুজ চা বাগান পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে, নীচে একটা নদী, কমলালেবুর বাগান।

প্রিয়া বলে — তাহলে খুবই সুন্দর জায়গা। তাই চল ওই দূর চা বাগানে

গেলে কাকাবাবু কোন খবরই পাবে না। কর্নেল আংকেল তুমিও চলে আসবে মাঝে মাঝে।

কর্নেল বলেন — ওখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?

বিজয় বলে — রায় কাকাও দারুন মজার লোক। আপনার সঙ্গে দারুন ভালো জমবে। আপনিও চলে এসে নিজের চোখে সবই দেখবেন। সামনের কলেজের লম্বা সামার ভেকেশন। কোন অসুবিধাই হবে না ওখানে।

কর্নেলও ভাবছেন কথাটা। কি ভেবে বলেন — ওদের ফোন আছে তো? নম্বর জানো?

বিজয় বলে — আমার নোটবইতে লেখা আছে, এখানে এসেও দু-একবার কথা বলেছি।

— তাহলে ফোন কর। যা ঘটেছে সব বলো। তোমাদের যাবার কথাও বলো। চলো—আমিও কথা বলব ওর সঙ্গে।

কর্নেল ওদের দায়িত্ব নেয়। আজ ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবেও চিন্তিত। বিজয় বলে — চলুন।

মিঃ রায় চা বাগানের অফিসেই ছিলেন। ফোনটা তিনিই ধরেন। বিজয়কে তিনি চেনেন তাই ওর ফোন পেয়ে খুশীই হন। কর্নেলও কথা বলে খুশী হন। অবশ্য মিঃ রায়কে সব কথা ফোনে জানানো যায় না। কর্নেল বলেন,

—ওরা সামারের ছুটিতে আপনার ওখানে কিছুদিন-এর জন্য বেড়াতে যেতে চায়। আমার ভাইঝিও যাবে বিজয়ের সঙ্গে।

মিঃ রায় বলেন—বেশ তো ওদের পাঠিয়েদিন। আর কর্নেল সাহেব আপনার কত নাম শুনেছি। আপনিও যদি এখানে আসনে দারুন খুশী হবো। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। আপনারও ভালো লাগবে।

কর্নেল বলেন - দেখি। ওরা তো যাচ্ছে যদি পারি একবার ঘুরে আসবো।

— এলে খুব খুশী হবো। বিনীত আমন্ত্রণই রইল।

সময়ও বেশী নেই। ওদিকে ব্রজকিশোরও পাল্টা আক্রমণ হানবে। তার আগেই ওদের সরিয়ে দিতে হবে। প্রিয়া বিজয়ও তৈরী হয়েছে। ছনু-এর মধ্যে একটা গাড়ি ডেকে এনেছে। কর্নেলের গাড়ি ব্রজবাবু চেনে। ওর লোকেরাও দেখেছে গাড়িটাকে। তাই কর্নেলের গাড়িতে না গিয়ে অন্য গাড়িতেই পাঠিয়ে দেন কর্নেল অন্য পথে।

কলকাতায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই আর নিরাপদ নয়, সেটা বুঝেছেন কর্নেল। তিনি প্রিয়ার ওই কাকাকে চেনেন লোকটা অত্যন্ত লোভী স্বার্থপর, তাই নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সব কাজই সে অনায়াসে করতে পারে তা যত কঠিন বা নিষ্ঠুরই হোক না কেন, সেটা সে করবেই।

প্রিয়া তার কথামত চলতে চায়নি। সে ওর কথার অবাধ্য হয়ে ওইভাবে রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে চলে এসেছে এখানে। ওর কাকা কোন মতেই এটা মুখ বুজে মেনে নেবেন না। সে অন্ধকার জগতের লোক। আইন কানুন, থানা-পুলিশ এসবের দিকে সে অবশ্য যাবে না। তার লোকবল, অর্থবল আছে। সে হয়তো এখানে হামলাই করে বসবে। প্রিয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

অবশ্য কর্নেল ওর সেই হামলাকে ভয় করে না। তাকে বাধা দেবার মত শক্তি তার আছে। দেবেনও। অসহায় মেয়েটাকে বিপদের মুখে ফেলে দেবেন না। তাছাড়া প্রিয়ার উপর নিঃসন্তান কর্নেল সাহেবেরও একটা মায়া পড়ে গেছে। তাই তিনি প্রিয়ার কাকা ব্রজকিশোর বাবুর সব অন্যায় কাজেই বাধা দেবেন। তাতে অশান্তিও বাড়বে। সেটা এড়াবার জন্যই কর্নেল সাহেব বিজয় প্রিয়াকে সরিয়ে দিতে চান এখান থেকে কিছু দিনের জন্য।

তারজন্যই ওদের মিঃ রায়ের চা বাগানে পাঠিয়ে দিতে চান।

কথাটা ওদের দুজনকেও বলেছেন। আর তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে ওদের। বিজয়ও বিপদে পড়েছিল। প্রিয়াকে সে সত্যিই ভালবাসে। কিন্তু তার সব ভার নেবার মত শক্তি এখনও তার নেই। তাই প্রিয়ার জন্য সেও ছিল চিন্তিত। কিন্তু সেই চিন্তা দূর করেছেন কর্নেল নিজে। তিনিই ওদের চা বাগান অঞ্চলে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

কর্নেল জানে প্রিয়ার কাকা সাংঘাতিক লোক। প্রিয়া বাড়ি থেকে চলে যেতেই সেও তার লোকজন দিয়ে প্রিয়ার সন্ধান শুরু করেছে। ওদের গতি সর্বত্র। ওরা ষ্টেশনেও গিয়ে খোঁজ করেছে। নিশ্চয়ই। তাই ট্রেনে নয়, ওদের টানা গাড়িতেই পাঠিয়ে দিতে চান। কারণ পথে সব গাড়ি চেক করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এত রাত্রে ট্রেনও নেই তাই ওদের গাড়িতেই তিনি কলকাতা থেকে বের করে দিয়েছেন। ওদের গাড়ি বারাসাত পার হয়ে নর্থবেঙ্গল যাবার রাস্তায় ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে।

বিজয় বলে,

— চলো এবার নতুন এক দেশে। পাহাড় ঘন তরাই-এর অরণ্য। সবুজ চা বাগান, নীল আকাশ।

প্রিয়াও এমন অজানা সুন্দর জগতে হারিয়ে যেতে চায়। এই কলকাতার জীবন এই পরিবেশ তার কাছে বিশ্রী ঠেকে। এখানে তার কাকা কাকীমার লোভী সত্বাটাকে সে দেখেছে। সেও এসব কিছু থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই ছুটে এসেছিল বিজয়ের কাছে। এবার তারা দুজনে কোন অজানা জগতের পথে চলেছে।

প্রিয়া বলে,

—চা বাগান ওই পাহাড়ের দেশে আমি কখনো যাইনি। কেমন জায়গাটা

বিজয় বলে,

—দারুন, ওখানে আমি এর আগেও দু-একবার গেছি। আমার দেশও ওই দিকে।

—উত্তরবঙ্গে?

—হ্যা। অবশ্য আমাদের বাড়ি ছিল সমতলে। চা বাগান-পাহাড় থেকে অনেক দূরে। সবুজ ছায়াঘেরা গ্রাম। নদী—

বিজয়ের চোখের সামনে তার ফেলে আসা গ্রাম — সেই ঘরবাড়ি তার বাবার কথা। সেই অতীতের দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে। সব কোনদিকে হারিয়ে গেছে তার।

বিজয় বলে,

—আমাদেরও একটা চা বাগান ছিল।

প্রিয়া দেখছে বিজয়কে। রাতের অন্ধকারে গাড়িটা ছুটে চলেছে। চারিদিকে অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে কিছু তারার দেখা মেলে মাত্র। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ি হেড লাইটের তীব্র আভা ফেলে ছুটে আসে। পাশ কাটিয়ে একটা ধাবমান শব্দ তুলে হারিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। পিছনের লাল আলোর আভাও ক্রমশ মিলিয়ে যায়।

বিজয় বলে,

—তখন দু'একবার বাবার সঙ্গে গেছি আমাদের চা বাগানে। আমার কি স্বপ্ন ছিল জানো?

প্রিয়া চাইল ওর দিকে, বিজয়ের চোখে তখন কল্পনার সেই ছবি। বিজয় বলে,

—আমি বাবাকে বলতাম আমি চা বাগানের ম্যানেজার হবো। টি প্লান্টার হবো।

—টি প্লান্টার? প্রিয়া ওই কথাটা নতুন শুনছে। বলে— কলকাতা শহরে থাকি এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখিনা। তবে বিখ্যাত লেখক মুলুকরাজ আনন্দ-এর লেখা 'টু লেকস এন্ড এ বার্ড' বইটা পড়েছি। চা বাগানে যে এতসব ঘটে তা জানা ছিল না।

বিজয় চা বাগান সম্বন্ধে কিছু জানে। সে চা বাগানে গেছে দেখেছে সেই বন পাহাড়কে। জেনেছে চা গাছ যারা তৈরী করে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই। সেইসব অজানা কাহিনী। সেই আদিম আরণ্যক জগৎ তার কিশোর মনকে আলোড়িত করেছিল। বিজয় বলে,

—আমরা ঘরে বসে সহজেই এখন দামী সুগন্ধী চা খাই। কিন্তু তার অতীতের ইতিহাসটাকে জানিনা। চায়ের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রথমে চীন দেশের কথাই মনে পড়ে। চীনদেশেই চা-এর প্রচলন শুরু হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে। ওখানে পার্বত্য প্রদেশে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চায়ের গাছ ভালো হয়। ওদের ওখানে চৈনিক সন্ন্যাসীরা ছিলেন চায়ের প্রথম গুনগ্রাহী। তারাই দেশে চায়ের চাষ শুরু করেন। আর তারাই বিদেশে তাদের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে চাও বিদেশে রপ্তানী করতে থাকে।

ক্রমশঃ ব্রিটিশরা চীনে আধিপত্য বিস্তার করলো — আর তারাও ঐ পরিবেশে চায়ের ভক্ত হয়ে পড়লো। ওদের মধ্যে বেশ কিছু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিলেন। তারা এবার চায়ের চাষ করার কথাও ভাবতে শুরু করলেন।

তখন ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব। বাংলাদেশের জলবায়ু সম্বন্ধে তারাও ওয়াকিবহাল হয়েছে। দেখছে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অরণ্য। সেই জায়গায় যথেষ্ট ঠান্ডাও রয়েছে। বৃষ্টিপাতও হয় প্রচুর আর পাহাড়ের ঢালু জমিতে জল দাঁড়ায় না। ওই মাটি ওই পরিবেশ চা চায়ের বাজার পাবার জন্য বাংলাদেশেই আর আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক হারে চা চাষ করার কথা ভাবতে থাকে।

এর মধ্যে চীন থেকে প্রচুর চায়ের চারা — আর চা গাছের পর্যটকদের

জন্য কিছু চীনা মজুরদেরও এনে তরাই, আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চায়ের চাষ শুরু করে। তখনও অবশ্য প্রাথমিক ভাবেই সেটা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় আসামের তরাই অঞ্চলের চা গাছগুলো থেকে উৎকৃষ্ট মানের চা পাতা হচ্ছে আর চায়ের গুনমানও উন্নত ধরণের।

এবার ইংরেজও চা চাষের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে ওইসব বনপাহাড় সাফ করে চায়ের বাগান বানালো। তাদের সরকার ইংরেজ বণিকদের এই কার্যে উৎসাহ দেবার জন্য তাদের বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান করার জন্য খুবই সস্তাদরে হাজার হাজার একর জমিও দেয়।

কিন্তু ওইসব অঞ্চলে তখনও গভীর অরণ্য। ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের রাজ্য। তাছাড়া বনে রয়েছে হাতি-বাঘ-বাইসন। তাই মৃত্যু বিভীষিকা ময় জগতে কাজ করতে আসার জন্য উপযুক্ত শ্রমিকও মিলছে না। কিছু সংখ্যক এলেও তা পর্যাপ্ত নয়। তাদের অনেকেই এই অস্বস্তি কর পরিবেশে মারা পড়ে। অথচ এমন অবস্থা তাদের চা বাগান চালাতেই হবে।

তাই শ্রমিকের দরকার। না হলে এতবড় একটা ব্যবসার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। তাই ইংরেজ সরকার তখন ছোটনাগপুর, সাওতাঁল পরগণা অঞ্চলের দরিদ্র — অজ্ঞ শ্রমিকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে সেই আদিম আরণ্যক পরিবেশে চা বাগানের কাজে আনে।

একবার যাদের আনে তাদের আর ফেরবার পথ থাকে না। এই মৃত্যুর জগতে তারা লড়াই করে বাচাঁর তাগিদে। চা গাছ বড় হয়ে ওঠে। সবুজ হলুদ চা পাতার ভিড়ে সারাবাগান ঝলমল করে। দুটি কচি হলুদ পাতার প্রান্তে একটি করে কুড়ি। সেই কচিপাতা আর কুড়ি নিয়েই তৈরী হয় উৎকৃষ্ট চা যা শহরের মানুষের রূপোলী কাপের শোভাবর্দ্ধন করে।

কিন্তু সেই দুটি পাতা একটি কুড়ির পিছনে কত মানুষের ঘাম রক্ত মৃত্যু। কতযুগের বিদেশীদের অত্যাচারের কাহিনী মিশে আছে তার হিসাব অনেকেই জানেনা।

প্রিয়া বলে,

— এখন তো আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক এখন তো শুনি চা বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা বদলেছে। তারাও মানুষের মত বাঁচার অধিকার পেয়েছে।

বিজয় বলে,

—ওসব তো দূরের বাদ্যি। দূরের বাদ্যি শুনতে ভালোই লাগে। কাছে গেলে সেই সুরটাকে বিকৃতই মনে হয়।

অবশ্য আমি অনেক দিন যাইনি ওখানে। এখন তারা কেমন আছে কে জানে। অবশ্য এখন তো শক্তিমানদের যুগ — তাই মনে হয় বাইরের খোলসটা বদলালেও ভিতরের রূপটা প্রায় তেমনই আছে। চল গিয়েই দেখা যাবে।

ওদের গাড়ি চলেছে।

ফারাক্কায় পদ্মা পার হয়ে ওরা মালদহ ছাড়িয়ে চলেছে। সেই দূর সবুজের দেশে। প্রিয়ার চোখে ঘুম নামে — বিজয় দেখে আকাশ এর বুক থেকে এবার অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আসছে নতুন দিনের আলো। সে জানেনা এদিন তাদের জন্য কি সম্ভাবনা নিয়ে আসবে?

ব্রজকিশোরও বসে নেই। পুলিশের কিছু লোককে সেও টাকা দেয় নিয়মিত। টাকা দিয়ে ওর ওইসব ব্যবসাপত্র ঠিকমত চালায়। তাই পুলিশের বেশ কিছু লোকের সঙ্গে তার চেনা জানা। ব্রজবাবুও এর মধ্যে থানায় মিসিং ডাইরী করেছে আর পুলিশকে নিয়ে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে হানা দেবার পরিকল্পনাও করেছে।

অবশ্য এর মধ্যে ব্রজকিশোর তার কুলটির দলকেও এদিক ওদিক ফিট করে রেখেছিল। কর্নেলের গাড়ির উপর নজর রেখেছিল তারা হয়তো ওই গাড়িতে কর্নেল প্রিয়াকে পাচার করে দেবে। কিন্তু তারা কর্নেলের গাড়িকে বের হতেই দেখেনি। অবশ্য তার আগেই তাদের সামনে দিয়ে অনেক গাড়ি ট্যাক্সিও যাতায়াত করছে। কর্নেল তেমন একটা ট্যাক্সিতে ওদের বের করে দিয়েছে এটা তারা জানতেও পারেনি।

ব্রজবাবু এবার পুলিশ নিয়েই এসেছে কর্নেলের বাংলোতে। পুলিশ অফিসারও একটু বিব্রত বোধ করে কর্নেলের সামনে। পুলিশ অফিসার বলেন,

—ওর ভাইয়ের মেয়েকে নাকি আপনি বাংলোতে আটকে রেখেছেন। স্যার আমাদেরও ডিউটি করতে হয়।

কর্নেলও বেশ সহজভাবে বলেন — ব্রজবাবু এর আগেও আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। এখনও তাই করতে চান। তাই এসব অসত্য অভিযোগ করছেন। মেয়েটি এখানে আছে কিনা নিজের চোখেই দেখে যান।

ব্রজকিশোর বলে — এখনও মিথ্যা কথা বলছেন। লায়ার—বাড়িতে সার্চ করুন অফিসার। তাহলেই সব সত্য প্রকাশ পাবে।

পুলিশ অফিসার তার দলবল নিয়ে বাংলোর সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার হদিস পায় না। প্রিয়ার কোন চিহ্ন এখানে নেই। কর্নেল বলেন,

—এবার যা সত্য তা প্রকাশ পাচ্ছে তো, বল্লাম সে নেই।

ব্রজকিশোরও অবাক হয়।

— তাহলে গেল কোথায়? সেই ছেলেটাকেও দেখছি না। প্রিয়াও নেই। পুলিশ অফিসার ওসব কথায় না গিয়ে এবার কর্নেলকে বলেন,

—আমাদের মাফ করবেন স্যার। ডিউটি হিসাবে সার্চ করতে হলো। আর মেয়েটি যে নেই তাও দেখছি। চলি স্যার - নমস্কার।

পুলিশ অফিসার দলবল নিয়ে গাড়িতে ওঠে। ব্রজকিশোর তখনও গর্জাচ্ছে পাচার করা হয়েছে। কর্নেল সাহেব আপনি চলেন ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়। সেই ছেলেটার সঙ্গে প্রিয়াকেও পাচার করা হয়েছে। ঠিক আছে আমিও দেখিয়ে দোব ব্রজকিশোরের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। আর ওদেরও কেমন করে বাঁচান আমার হাত থেকে সেটাও দেখবো। চল—

কর্নেলকে শাসিয়ে গাড়িতে উঠেছে ওরা। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি বের হয়ে গেছে। এবার এদের গাড়িতে স্ট্যার্ট নিতে গিয়ে দেখে গাড়ি চলে না। কে যেন সামনের দুটো চাকার হাওয়াই বের করে দিয়েছে। চাকা দুটো ফ্ল্যাট হয়ে মাটিতে বসে গেছে। দেখা যায় একটা গাছের নীচে নিপাট ভালো মানুষের মতো দাড়িয়ে আছে ছনু আর কালু। ওরা বলে,

—গাড়ি আর যাবে না স্যার। ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। ঠেলবো?

ব্রজকিশোর তার দলবল রাগে গজ গজ করছে। বলারও কিছু নেই। ওরা গাড়ি ফেলে রেখেই বের হয়ে যায়।

ব্রজকিশোর এবার চিন্তায় পড়েছে। মেয়েটা ওখানেও নেই। তাহলে গেল কোথায়? সেই ছেলেটাকেও দেখেনি আর। ভোম্বল বলে,

— পিসেমশাই প্রিয়া সেই ছেলেটার সঙ্গেই সিওর কেটে পড়েছে।

— সেই ছেলেটা কে? কোথায় তার বাড়ি? ব্রজকিশোর জানাতে চায়।

ভোম্বল বলে — তাতো জানি না। শুনেছিলাম কর্নেলের ওখানেই থাকতো। ওর কোন আত্মীয় হবে।

— ছাই জানো তুমি? কোন কম্মের নও। এখন যাও তো।

ব্রজকিশোর ভোম্বলকে তার অফিস থেকে বের করে এবার নিজের কাজে মন দেয়। যদিও কোন কাজে মন বসে না তার। প্রিয়াই এখন এসব কিছুর মালিক। সে যদি সত্যিই ওই ছেলেটাকে বিয়ে থা করে বসে তখন ছেলেটাই হবে তার স্বামী। প্রিয়া তখন তার কথামতই চলবে। আর ব্রজকিশোরের মনে হয় কর্নেলই এসবের পিছনে রয়েছে। সে কর্নেলের অনেক সর্বনাশ করেছে। আর এমন আঁটঘাট বেধে কাজ করেছিল যে কর্নেল এত চেষ্টা করেও তাকে বিপদে ফেলতে পারেনি। এবার কর্নেল হয়তো প্রিয়াকে হাতে এনে তার সর্বনাশ করতে চায়।

ব্রজকিশোর ক্রমশঃ তার নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে। টাকার লোভ মানুষকে একটার পর একটা অন্যায় করার কাজে দুঃসাহস যোগায়। ব্রজকিশোর বিল্ডীং ব্যবসার সঙ্গে এই কারখানা, দাদার সবকিছু হাতে পেয়ে আরও মরীয়া হয়ে উঠেছে। কুলকিপ্রসাদের সঙ্গে সে এবার অন্ধকারের ব্যবসাতে নেমেছে। কুলকিপ্রসাদ-এর পৈত্রিক আমলের একটা চা বাগান ছিল। কুলকি বাবার সেই চা বাগানেই কাজকর্ম দেখা শোনা করতো। কলকাতার অফিসেও আসতো। ক্লাবেও যেতো। ব্রজকিশোরের সঙ্গে ওর সেইখানেই পরিচয় হয়।

রতনে রতন চেনে। তাই ওদের দুজনের দুজনকে চিনে নিতেও দেরী হয় না। কুলকির চা বাগানটা একেবারে পাহাড়ের সীমান্তে ওপারেই নেপাল। মাঝখানে একটা পাহাড়ী নদী, ওপরে নেপালের ঘন জঙ্গল এলাকা। শালগাছের বিশাল জঙ্গল। ওই দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা রোপওয়েতে ওপর থেকে এপারে দামী কাঠ আসে। লাখ লাখ টাকার কাঠ।

কুলকিপ্রসাদ চায়ের ব্যবসার সাথে কাঠের ব্যবসাও চালু করে। শিলিগুড়িতে বিরাট করাতকল তার। ক্রমশঃ কুলকি দেখেছে নেপাল থেকে কাঠের চেয়ে বহু দামী জিনিষ এদিকে এনে ব্যবসা শুরু করলে অনেক বেশী লাভ হবে। তাই কুলকি ওদেশ থেকে বেআইনী ভাবে অনেক মালই আনে। কিন্তু কলকাতায় একটা মজবুত ঠেকের দরকার যেখান থেকে নিরাপদে এইপথে মাল পাচার

করে যাবে। ব্যবসাও চলবে। তাই সে ব্রজকিশোরকে বেছে নেয়। ওর বিশাল কারখানায় জায়গা অনেক, সুরক্ষিত। আর তাদের সুনামের জন্য পুলিশও তাদের ঘাটাবে না।

আর ব্রজকিশোরের সঙ্গে পুলিশের এক মহলের বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। তাই কুলকিপ্রসাদ ব্রজকিশোরের গুদামেই মাল তোলে সেখান থেকেই পাচার করে। ব্রজও অনায়াসেই অনেক টাকা পায়। আর টাকার লোভেও এখন তারা অন্যদিক থেকে নেপাল হয়ে লাখ লাখ টাকার অস্ত্র বিস্ফোরকও আমদানী করছে। কুলকিপ্রসাদও বাইরের দেশের গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। ওদের মালপত্রও আসে তার মারফৎ. ফাঁক থেকে প্রচুর টাকাও এসে যায়। ব্রজকিশোরও এই অন্ধকারের কারবারে জড়িয়ে পড়েছে।

প্রশাসনও এখন টের পায় কিছু এজেন্টেদের — তাদের সন্ধান করছে সেইসব এজেন্টরা বিদেশের হয়ে এদেশের সক্রিয় জঙ্গীদেরও নানাভাবে সাহায্য করছে। অস্ত্রের যোগান দিচ্ছে, গুলি গোলাও সাপ্লাই দিচ্ছে নিয়মিত। ব্রজকিশোর সেইসব কাজে ব্যস্ত।

কুলকিপ্রসাদ মাঝে মাঝে তার চা বাগানো যায়। সেখান থেকেও চায়ের পেটিতে চায়ের সাথে অনেক বেআইনী মালপত্র পাচার হয়।

তেমন একটা বড় চালান আসবে — সেগুলোর বিক্রীর কথাও চলছে ব্রজকিশোর সেদিন তার বাড়ির অফিসে সেইসব কাগজপত্রের ফাইল হাতড়াতে গিয়ে দেখে তার সেই দামী দলিল ভর্তি এটাচিটাও নেই। আরও বেশকিছু ফাইল কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। চমকে ওঠে ব্রজকিশোর। সব আলমারী লকার খুঁজেও সেই এটচিটা পায় না। তাতেই রয়ে গেছে কারখানার সেই দলিল তার আসল কপি। আর তার বেআইনী অস্ত্রচালানের কাগজপত্র

ব্রজকিশোর চমকে ওঠে। কে সরালো এসব? তাহলে প্রিয়াই এই কাজ করে সেই আসল দলিল কাগজপত্র নিয়ে কেটে পড়েছে। এবার চরম সর্বনাশ না হয়। মেয়েটা যে তার এতবড় সর্বনাশ করবে তা ভাবতেও পারেনি এখন যেভাবে হোক প্রিয়াকে ধরতেই হবে। কর্নেল প্রিয়া বিজয়দের চলে যাবার ব্যবস্থা করে খুশীই হয়েছেন। ব্রজ কিশোরকেও শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছে।

এবার কর্নেল ছনু-কালুর সংগৃহীত সেই এটাচির কাগজপত্র দেখছেন হালকা মনে। ওরা নাকি পথে এসব কুড়িয়ে পেয়েছে। আর যদি দলিলের মালিকের সন্ধান পান তবে কর্নেল ওসব সেই মালিককে ফিরিয়ে দেবেন।

একটা পুরোনো দলিল পড়তে পড়তে কর্নেল এবার চমকে ওঠেন। বিজয়ের গ্রামের নাম তার বাবার নাম কর্নেল জানেন। বিজয়ের বাবা যে জমিদার ছিলেন তাও জানেন। সেই নরনারায়ণ বাবুই যে তার বন্ধু নন্দকিশোর বাবুকে অনেক টাকা দিয়ে এখানের কারখানার পার্টনার হয়েছিলেন সেই দলিলটা। অর্থাৎ বিজয়ের সর্বস্ব চলে গেলেও সে এখন ব্রজকিশোরের দখল করা প্রিয়ার বাবার কারখানার একজন অংশীদার। প্রিয়ার সাথে বিজয়ও কারখানার মালিক। ব্রজবাবু কেউ নন জবর দখলকারী মাত্র।

শুধু কারখানাই নয় ওই বিশাল বাড়ি জমি। ব্যাঙ্কের টাকা, সবকিছুই ওদের দুজনার। কর্নেল এবার করার মত একটা কাজ পেয়ে খুশী হন। বিজয়ের এবার দিন বদলাবে আর ব্রজকেও এবার বের করে দিতে পারবেন কর্নেল।

ওদের একটা মোটা খামে দামী বিদেশী কাগজপত্র দেখে পড়তে থাকেন। বিদেশের কোন এজেন্ট একটা কোম্পানীর নামে বেশ কিছু আপত্তিকর যন্ত্রাংশ পাঠাচ্ছে। কর্নেল মিলিটারীতে ছিলেন—এসব যন্ত্রের কোর্ড পিন জানেন তাই এইসব চালানের ব্যাপার দেখে চমকে ওঠেন। বিপুল পরিমাণে যন্ত্র আমদানী করেছে এরা আসছে প্রচুর বিস্ফোরক। আর সে সব আসছে নেপাল হয়ে কোন চা কোম্পানীর নামে। যেন চায়ের অর্ডারই আসছে। চিঠিতে বেশকিছু সাংকেতিক কোড নং ব্যবহার করা হয়েছে। যার সম্যক অর্থ বুঝতে না পারলেও যা বুঝেছেন তাতে মনে হয় এসব অস্ত্র এখানে পাঠাচ্ছে কোন বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা—দেশের ভিতরের শান্তিশৃঙ্খলাকে তছনছ করতে। দেশের পয়লা নম্বর শত্রু এরা।

শুধুমাত্র প্রচুর টাকার লোভেই এই কাজ করছে এদেশে বিদেশীদের এজেন্ট হয়ে। কর্নেল এতবড় গুরুতর খবর পেয়ে চমকে ওঠেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তাদের এসব জানানো দরকার। তাই কর্নেল ছনু-কালুকে ডেকে এনেছিল তার ঘরে। ওদের গুনের কথা কিছু জানেন। হয়তো কোথাও হানা

দিয়ে এসব এনেছে। সেই খবর জানতে পারলে কাজের সুবিধা হবে। কর্নেল শুধোন — ঠিক করে বল। কোথায় এসব পেয়েছিলি?

ছনু, কালুও বুঝেছে কেস গুরুতর। আসল কথা বললে বিপদ আরও বাড়বে। তাই কালু বলে,

—আজ্ঞে পথ দিয়ে আসছিলাম। পথে খুব গাড্ডা —ঝাকুনিতে একটা গাড়ির ডিক্কি খুলে গেল।

— চোপ। মিথ্যা কথা বলছিস। ধমকে ওঠে কর্নেল। বলেন — তোদের দুটোকেই আউট করে দেবো। ঠিক করে বল।

কর্নেল অবশ্য বুঝেছেন। এসব ব্রজকিশোর-এর বাড়ি থেকেই পেয়েছে ওরা। কারণ ওই কারখানার দলিল ব্রজের কাছেই ছিল। আর ব্রজকিশোর টাকার জন্য সব কাজই করতে পারে। ওই বিদেশীদের এজেন্ট হয়তো সে-ই। তবে ওই চাবাগানের সঙ্গে কি সম্পর্ক সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। ওরা একটু ধমকে খেয়ে বলে—একাজ আর জিন্দেগীতে করবো না স্যার— ওসব পেয়েছি ওই ব্রজকিশোর বাবুর বাড়িতে।

কর্নেল বলেন — যা। এ্যাই শোন, এসব কথা আর কাউকে বলবি না। পুলিশও যেন না জানতে পারে।

ছনু কানে হাত দিয়ে বলে — না হুজুর মাই বাপ। এসব কথা কেউ জানবে না।

কর্নেলের ভয় হয়। এসব কথা স্থানীয় পুলিশ জানলে ব্রজকিশোরের কানে যাবে। আর ব্রজকিশোর সাবধান হয়ে যাবে। হাজারো দেশভক্ত সৈনিক সীমান্তে রক্ত দিচ্ছে-প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্য। আর দেশের ভিতর দেশের শত্রুরা আরামে সমাজের মাথা হয়ে থাকবে। একজন সৈনিক হিসাবে এটাকে তিনি মেনে নিতে পারবেন না। এই আসামীদের হাতে নাতে পেয়ে চরম শাস্তিই দেবে।

কর্নেল সমরজিৎ প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তার কর্মজীবনে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কখনও হায়দ্রাবাদে — কখনও গোয়ায় কখনও পূর্ব বাংলার মাটিতে কখনও পাঞ্জাবের মাটিতেও লড়েছিল। জয়ী হয়েছেন। ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি ঘটেছে। শেষ লড়াই লড়েছেন কারগিলের বরফ ঢাকা পাহাড়ে, লড়েছেন দিনরাত ওই বরফের রাজ্যে। মরণপন লড়াই করে

শত্রুদের ভারতের মাটি থেকে তাড়িয়েছিল। নিজে আহত হয়েছেন। তার সেই বীরত্বের কথা প্রতিরক্ষা বিভাগের অনেকেই আজও ভোলেনি! দু-একজন সহকর্মী এখনও রয়েছেন। তারাও কর্নেলকে দেখে খুশী হন।

— আরে ইয়ংম্যান—কেমন আছো ওয়েল কাম।

কর্নেল নমস্কার করে বসেন। বলে — একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। দেশের মধ্যে একটা চক্র বিদেশী এজেন্টদের হয়ে কাজ করছে মনে হচ্ছে। কাগজপত্র বের করে দেখাতে একজন কর্তা বলেন,

— মাই গুডনেস। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার কর্নেল সাব। এদের ধরতেই হবে।

কর্নেল বলে — পুলিশের কাছে প্রথমে এসব জানালে হয়তো অসুবিধা হবে। নিজেদের তদন্ত করে এদের হাতে নাতে ধরতে হবে। তারপর আইনের ব্যাপার। প্রথমে ওদের হাতে নাতে ধরা দরকার। আর তা করতে হবে নিজেদেরই খুব গোপনে। ওদেরও নিজেদের খবর সংগ্রহ করার নেটওয়ার্ক আছে।

প্রতিরক্ষা অফিসার বলেন — কারেক্ট, কর্নেল সাহেব এ কার্যে আপনার সাহায্যের দরকার আছে। অবশ্য আপনি যদি রাজী থাকেন।

কর্নেল বলেন — নিশ্চয়ই। এতকাল দেশের সঙ্গে লড়েছি, আহত তবু তাকে থামানো যাবে না মেজর। আই এম অলওয়েজ এ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আমিও চেষ্টা করছি। তোমরা তদন্ত চালিয়ে যাও। নেপাল বর্ডারে। ওদিকেই এদের অপারেশন চলেছে।

বিজয় প্রিয়া সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমেছে। অবশ্য ট্রেনটা নিউজলপাইগুড়ি পৌছাবার আগেই প্রিয়া ট্রেনের কামরা থেকেই আকাশের বুকে সকালের সোনা রোদ মাখা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখে খুশীতে উচ্ছাসিত হয়ে ওঠে। বরাবর কলকাতাতেই মানুষ হয়েছে সে। দুদিকে সবুজ চা বাগানের গালিচা দিনের প্রথম আলোয় কুয়াশা ভিজে গাছগুলো আরও সবুজ সতেজ হয়ে উঠেছে প্রাণের উচ্ছলতায়।

প্রিয়া বলে — কি সুন্দর!

বিজয় বলে — যেখানে যাচ্ছ সে জায়গা আরও সুন্দর।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমেছে ওরা। প্ল্যাটফর্মেই এসেছে মিঃ রায়ের বাগানের একজন সহকারী ম্যানেজার তিনি পুরোনো কর্মচারী। তাই চেনেন বিজয়কে। বিজয়ও ওকে দেখেছে। প্রিয়াকে নিয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে আসে ওরা। গাড়িও রয়েছে, ওরা বের হয়ে পড়ে।

শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা ছুটে চলেছে মিরিকের দিকে। এইপথ ডাউলিং রোডের তুলনায় কিছুটা নির্জন। বালসন নদী পার হয়ে এবার পাহাড় ঠেলে উঠেছে গাড়িটা। সামনে সবুজ বন - চা বাগান। পাহাড় আর পাহাড়।

মিঃ রায়-এর চা বাগানের বাংলোটা একটা ছোট পাহাড়ের মাঝে। নীচ থেকে পথটা এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। দুদিকে গাছ গাছালি। ওদিকে ছোট একটা পাহাড়ী নদী নুড়ি বিছানো খাদে সুর তুলে বয়ে চলেছে। প্রিয়া এই জগতে এসে যেন সব চিন্তা ভাবনা কি এক খুশীর রাজ্যে হারিয়ে গেছে। প্রিয়ার চোখে খুশীর আবেশ, আজ যেন এক অনাবিল মুক্তির আনন্দ তার সুরে জাগে। বিজয়ও এই সবুজ স্বপ্নের জগতে কদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।

সকালের কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের নরম আলোর পরশ জাগে আকাশে বাতাসে চা বাগানে। কুলি ছেলে মেয়েরা সেজেগুজে সবুজ গাছের উপর থেকে হলুদ কচি পাতাগুলো নখের আঘাতে যন্ত্রের মত তুলে পিছনে ঝোলানো ব্যাগে ফেলে আর খুশীতে গান গায়।

'ও কুসুম ঝোরার ধারে লো
দেখলাম আজ তুমাকে
মনমে কেমন করে গো। —'

ওই সুর বাগানে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। ওরাও বের হয় সকালে। গাড়িতেই ড্রাই লাঞ্চ তুলে নেয়। বাংলা নেপাল সীমান্ত এখানে কাছেই। মাঝখানে একটা নদী, দুই পাহাড়ের মধ্যে নদীটা বয়ে গেছে। ওদিকে পথ তেমন নেই। তবে পায়ে চলা পথ আছে। পাহাড়ীরা পিছে মাল নিয়ে যাতায়াত করে। ওদিকে রোপওয়েটা শূন্যপথে চলে গেছে। ওই তীরে মাঝে মাঝে শূন্য পথে ট্রলিতে দুলতে দুলতে বড় বড় লগ্। অন্যসব মালপত্রও আসে। ওদিকে নদীর ধারে একটা উঁচু মাচানে এসে টাবগুলো থামে। মালপত্র খালাস হয়ে শূন্য টাবগুলো আবার ফিরে যায়।

ওটা অন্য চা বাগানের এলাকা। প্রিয়া বিজয় কখনও গাড়ি নিয়ে ভুটান সীমান্ত শহর ফুন্টশেলিং — কখনও চালসা ছাড়িয়ে সামসিং-এর সবুজ পাহাড়ে কখনও জলঢাকা-ঝলং ছাড়িয়ে বিন্দুর কাছে চলে যায়। কোনদিন ঘুরে আসে গরুমারা অভয়ারণ্যে কোনদিন জলদাপাড়াতে।

মিঃ রায় বলেন — বেশী রাত করো না। সন্ধ্যার আগেই ফিরবে।

বিজয় বলে — না হলে হাতির সামনে পড়ব না?

এর মধ্যে ওরা গরুমারা অরণ্যের বাইরে হাতির পালের সামনে পড়েছিল। প্রিয়াতো ভয়ে বিজয়কে জড়িয়ে ধরে, বিব্রত বোধ করে বিজয়। প্রিয়া ভীত কণ্ঠে বলে — এত হাতি কি হবে?

বিজয়ও জানে না। প্রিয়াকে বাঁচাতেই তাই বলে — কোন ভয় নেই।

ড্রাইভারও গাড়ি থামিয়ে বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলে,

—ওরা সিধে বনের মধ্যে চলে যাবে। কোন শব্দ করবেন না। প্রিয়ার হাতটা বিজয়ের হাতে কি যেন এক নির্ভর খুঁজছে। হাতিগুলো অবশ্য এদিকে আসে না। ওরা গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে বনের গভীরে চলে গেল। প্রিয়াও নিশ্চিন্ত হয়।

বিজয় বলে — এত ভয়?

প্রিয়া কদিনেই এই সুন্দর পরিবেশে এসে বিজয়কে আরও কাছে পেয়েছে। সে বলে — আমার জন্য নয়! ভয় তোমার জন্য। যদি তোমার কিছু হয়ে যায়। আমার কি হবে?

বিজয় চাইল, প্রিয়া বলে — এতবড় দুনিয়ায় আজ আমার পাশে তুমি ছাড়া কেউ নেই বিজয়, বুঝেছ তোমায় ছেড়ে বাঁচা আমার পক্ষে মুস্কিল।

বিজয়ও ভাবছে কথাটা। সেদিন মিঃ রায়ও ওদের বেলাবেলি ফিরতে বলেন।

— বিজয়! হাতির কথা বলছো— হাতি বাঘ তো আছেই তাছাড়া এই বর্ডার এলাকাতে নাকি এখন বিদেশী লোকের আনাগোনা চলে — তারা মোটেই ভালো মানুষ নয়।

বিজয় বলে — সেকি! এই শান্তির রাজ্যেও অশান্তির ঝড় উঠেছে?

— এই শান্তিকেই তো শেষ করতে চায় বিদেশী শত্রুর দল। তার জন্য এদেশের শয়তানদেরও তারা টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করেছে। আমি

আমাদের বাগানের পথে বাইরের কোন গাড়ি ঢুকতে দিই না। তাই ওরা আমার উপরও খুশী নয়। তোমরা আমার অতিথি তাই একটু সাবধানে ঘোরা ফেরা করতে বলছি।

বিজয় বলে — তাই হবে কাকাবাবু, আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না।

মিঃ রায় বলেন — কলকাতায় কথা হয়েছে কর্নেল সাহেবের সঙ্গে?

— হ্যাঁ। ওকেও আসতে বলেছি। কর্নেল আংকেলও বলেছেন একদিন চলে আসবেন।

মিঃ রায় বলেন — হ্যাঁ তাই বলো। প্রিয়া কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো?

— না - না ঠিক আছে।

— আসলে চাকর-বাকর-এর সংসার ওরা হয়তো ঠিকঠাক দেখাশোনা করতে পারছে না।

প্রিয়া বলে — না -না, কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

প্রিয়াই এখন যেন নতুন করে ঘর বেধেছে এখানে। কলকাতার বাড়িতে সে বন্দী হয়ে থাকতো। এখানে এর মধ্যে প্রিয়া বেয়ারাকে নিয়ে কিচেনে যায়। নিজের হাতে দু'একটা পদও বানাতে পারে সে।

অবশ্য প্রথম প্রথম ওমলেট বানাতে গিয়ে কি অবস্থা হয়েছিল সেকথা মনে পড়লে এখনও প্রিয়ার হাসি পায়। কিভাবে ডিম ফাটাবে সেটা বুঝতে না পেরে এমন জোরে ডিম ঠুকেছিল যে কুসুমটা গিয়ে বিজয়ের মুখেই লাগে। হাসিতে ফেটে পড়েছিল প্রিয়া বিজয়ের ওই করুন অবস্থা দেখে।

এখন প্রিয়া নিজেই ব্রেকফাস্ট তৈরী করে। মাছ-মাংসের পদও তৈরী করে। মিঃ রায বলে — দারুন হয়েছে।

বিজয় বলে — একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে গেলে যে প্রিয়া।

— কেন আপত্তি আছে।

বিজয় বলে — না, তবে ভাবছি কি জানো?

— কি? প্রিয়া বলে।

বিজয় বলে — প্রিয়া আমার বরাতই মন্দ। জীবনে কিছুই পাইনি। সবই আমার হারিয়ে গেছে। তাই? এত সুখ কি সইবে? এসব যদি হারিয়ে যায়—

প্রিয়াও তার শূন্য বঞ্চিত জীবনে আজ অনেক কিছু পেয়েছে। একজনকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে সে। প্রিয়া বলে,

— না - না, ওসব কথা বলে না বিজয়। তোমাকে আমি হারাতে পারবো না।

শেঠ কুলকিপ্রসাদও খবর পেয়েছে ব্রজের সেই সোনার ডিম পাড়া চিড়িয়া কোনমতে শিকল কেটে আসমানে উড়ে গেছে কোন এক প্রেমিকের সঙ্গে। ব্রজকিশোরও বিপদে পড়েছে। সেই চিড়িয়া অন্যের হাতে পড়লে ব্রজকিশোর ভি ফেঁসে যাবে। ব্রজকিশোর বলে.

— চারিদিকে খোঁজ খবর করছি। কিন্তু কোথায় যে গেল মেয়েটা। যদি অন্য কোন ছেলেকে বিয়ে করে তো ঘোর বিপদ হবে। সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ওই কারখানাও।

কুলিকি বলে — তাহলে তো আমাদের এতবড় কারবার ভি চৌপট হয়ে যাবে। এমনিতে পুলিশ ভি পিছনে পড়েছে। বর্ডার-এ রোপওয়ের দিকে নজর রেখেছে।

ব্রজকিশোর বলে — কে জানে। ওই মেয়েটা আর ওর লাভারই পুলিশকে কোন খবর দিয়েছে কিনা।

কুলকি বলে — ধরতে পারলে খতম করে দোব দুটোকেই।

ব্রজকিশোর বলে — আগে ধরো ত। তারপর ভাবা যাবে কি করবো।

কুলকি বলে — দেখছি। একটা চালান আসবে, আমাকে চা বাগানে যেতে হবে, পরে এসে বাতচিত হবে।

কুলকি জানে তার এই কারবারই আগে — তারপর ওই চিড়িয়া ধরার কথা ভাবা যাবে।

প্রিয়া আর বিজয় এখন দুজনে এই এলাকাতে ঘোরে দূরের পাহাড় বন ঘেরা কোন বস্তির হাটেও যায়। এই হাটের দিন এলাকার চা বাগানগুলোর কাজ বন্ধ থাকে। আর হাট বসে চা বাগানের কুলিদের হপ্তার মাইনে পাবার দিন।

ফলে তাদের হাতেও কিছু পয়সা থাকে। গাছগাছালি ঘেরা মাঠে গ্রামের বাইরে হাট বসে। দূর দূরান্ত থেকে আসে পসারীর দল। ছেলে মেয়ে যুবক যুবতীরা

সেজেগুজে আসে। বেসাতি করে। আর মন দেওয়া নেওয়া হয়। দু-দশটা বাঁধান দোকানও থাকে। বেশীর ভাগ দোকান অস্থায়ী। সকালে এসে সস্তা মনোহারি জিনিষ, জামা ফ্রক ইত্যাদির দোকান সাজিয়ে বসে আবার সন্ধ্যায় চলে যায়।

এক বেলার পরমায়ু তবু সেই বেলাটাই ঔজ্জ্বল্যে সমারোহে ভরে ওঠে। আর বিকেলে নামার পরই শুরু হয় আদিবাসী কুলি ছেলেমেয়েদের নাচ। হাড়িয়া আর চোলাই মদের যোগান বন্ধ থাকে না। তাই নাচগান জমেও বাধা হয় না।

কেউ তার মানবীকে নিয়ে পালিয়েছে। এদের সামাজিক নিয়ম বড় বিচিত্র। ছেলেমেয়ে ভালোবেসে লুকিয়ে ঘর ছেড়েছে। মেয়ের বাবা দল বেঁধে খুজতে বের হবে এখানে সেখানে। অবশ্য এই খোঁজ চলবে একটা দিন রাত ফুঁড়ে। এর মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকা ধরা পড়ে গেলে প্রেমিককে মেরে সামাজিক দণ্ডও দেওয়া হবে। বিয়েও হবে না।

কিন্তু ছেলেমেয়ে যদি চব্বিশ ঘন্টা বা অধিক থাকে — তাহলে তাদের এই প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তাদের বিয়েও হবে। এক পলাতক প্রেমিক যুগলকে ধরে ফেলে মেয়ের বাপের লোকজন আর তাকে বেশ উত্তম মধ্যম দেওয়া হচ্ছে। অনেকে ঠাট্টাও করে,

— ক্যামন মরদ রে তু, একটা মেয়েকে লিয়ে পালাতে লারলি? মর ইবার।

বিজয় প্রিয়া হাটে এসে প্রেমিক বেচারার প্রেমের এমন পরিণতি দেখে হাসছে প্রিয়া। বিজয় বলে — তুমি হাসছ? তোমার সেই কুখ্যাত কাকাবাবু আমাকে ধরতে পারলে এর চেয়েও করুন হাল করে ছেড়ে দেবে।

প্রিয়া বলে — না মশাই আমাদের চব্বিশ ঘন্টা কবেই পার হয়ে গেছে।

বিজয় বলে — এতো ওদের নিয়ম। তোমার কাকার নিয়ম যে আলাদা তাই ভয় হয়।

— কাউকে আর মানি না। কাকাবাবু আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। উল্টে এবার ওর সব অন্যায়ের জবাবই দেব।

ওরা একটা গাছের নীচে অস্থায়ী চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছিল। প্রিয়ার এখন এই জীবনকে ভালো লেগেছে।

কুলকিপ্রসাদ কদিন তার চা বাগানে এসেছে। বাগান দেখার নাম করেও মাঝে মাঝে আসে। কুলকিপ্রসাদের বিদেশ থেকে এক এক লট মাল আসে।

সেই সব চালানের দাম কোটির কাছাকাছি। বিদেশী অস্ত্র-পিস্তল-ম্যাগাজীন, প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকও আসে। এছাড়া আসে বেআইনী ভাবে সোনার বিস্কুটও। তারজন্য নানারকম প্রস্তুতি নিতে হয়।

এখন বর্ডার সিকিউরিটি মায় মিলিটারীও কড়া পাহারা রেখেছে সর্বত্র। তারাও চেক করে, অনেকের মালপত্রও ধরা পড়ে। কিন্তু কুলকিপ্রসাদের কাজের ধারাটাই আলাদা। স্থানীয় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে তার হয়ে কাজ করে। কাঠের বোঝার মধ্যে ওইসব মাল ওরা আনে দুর্গম পাহাড়ী পথে রাতের অন্ধকারে। পুলিশের নজর এড়িয়ে। কখনও বা রোপওয়ের কাঠের লগে এর বাক্সের মধ্যে দিয়ে, সহজে তা ধরাও যাবে না।

কুলকিপ্রসাদ সেদিন তার লোকেদের সন্ধানে হাটে এসেছে। এখানে তার খাতির মান আলাদা। দু-একজন অবাঙালী ব্যবসাদার বিভিন্ন চা-বাগানে মাল সাপ্লাই করে। তারাই খাতির করে কুলকিকে বসিয়েছে। মাল এসেছে। কাঠের হালচাল নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে হঠাৎ কুলকিপ্রসাদ বিজয় আর প্রিয়াকে ওই গাছের নীচে মাচানে বসে থাকতে দেখে কেমন চমকে ওঠে। ব্রজকিশোর-এর বাড়ি সে যাতায়াত করে। প্রিয়াকেও দেখেছে অন্য সাজ পোষাকে।

এখানে এই পরিবেশে একেবারে দূর সীমান্তে প্রিয়াকে আবিষ্কার করবে তা ভাবেনি। তাহলে ব্রজকিশোরের সোনার ডিম দেওয়া চিড়িয়া উড়ে এসে এইখানে বাসা বেধেছে। ওই ছেলেটার সঙ্গে।

কুলকিপ্রসাদ শুধায় — আরে লছমনজী ওই ছেলে আর মেয়েটা নতুন মালুম হচ্ছে। চেনো ওদের? লছমন ছেত্রী মিঃ রায়ের বাগানে মালপত্র দেয়। ওখানেও যাতায়াত আছে ওর। কুলকির কথায় সে বলে,

— উরা তো ওই সিংটং চা বাগানের মালিক রায় সাহেবের বাংলোতে রয়েছে। কদিন হলো এসেছে এখানে। ওর কোই রিস্তেদার হবে।

— অঃ! কুলকিপ্রসাদ ওই প্রসঙ্গে না গিয়ে এবার চা-পত্তির হালফিল বাজার দর পাতার গুনমান নিয়েই আলোচনা শুরু করে।

ওদিকে বিজয় প্রিয়া উঠে পড়ে। ওদের ফিরতে হবে।

প্রতিরক্ষা বিভাগও এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেইসব কাগজপত্রের থেকে তারা বেশকিছু গুপ্ত খবরও পেয়েছে আর হেড কোয়ার্টার থেকে এদিকের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল নিজেও এই চক্রের সন্ধানে নেমেছেন। বিজয়রা রয়েছে ওই এলাকাতে। ওদের খবর অবশ্য এখনও ব্রজকিশোর পায়নি। তাহলে বিজয়দের উপর হামলা হতো।

ওদেরও খবর নেওয়া দরকার। তাছাড়া ওই এলাকাতে নিজেও যেতে চান কর্নেল। ব্রজকিশোর হয়তো কিছু করতে পারে। তাই ওদিকেই যাবার মত করেন। ব্রজকিশোর-এর মুখোস খুলতেই হবে। না হলে ওরা আরও কোন বিপদ আনবে তা কে জানে?

কর্নেল তাই কদিন বাইরে যাবার ব্যবস্থাই করেন। ছনু-কালুও তার ছায়াসঙ্গী। দুই মূর্তিকে কর্নেল অনেকটা শুধরে এনেছেন আর ওদের সাহস উপস্থিত বুদ্ধিও বেশ। ওরা যদি সৈন্য বিভাগে ঢুকতো যোগ্য সৈনিক হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তবু কর্নেল ওদেরই কাজে লাগাতে চান। তাই ওদের দুটোকেই বলেন,

— তোরাও যাবি আমার সঙ্গে।

ছনু কালুও খুশী হয়। নতুন দেশ দেখার আনন্দে।

ওরাও যাবার জন্য তৈরী।

এদিকে ব্রজকিশোর এখনও প্রিয়ার কোন খবর পায়নি। ছেলেমেয়ে দুটো যেন উধাও হয়ে গেল। এরপর বিয়ে থা করে ফিরে এসে আদালতের শরণাপন্ন হলেই ব্রজকিশোর বিপদে পড়বে। ভোম্বল এখনও হাল ছাড়েনি। তার দৃঢ় ধারণা এসব কিছুর মূলে ওই কর্নেল। তাই ওর গতিবিধের উপর নজর রাখার চেষ্টা করেছে সে। বাংলোর মালিকে টাকা দিয়ে হাতে আনে। সেইই বলে,

— ছোট সাহেব আর মেমসাহেব এখানেই এসেছিল। এখান থেকে কোথায় ভেগেছে তা জানিনা স্যার।

ব্রজকিশোরও এবার সেই খবরে বিশ্বাস করে। তাই বলে,

— খবর রাখ কর্নেল কোথায় যায় কিনা।

আর কদিন পরই ভোম্বল খবর আনে কর্নেল সাহেবকে দেখা গেছে দার্জিলিং মেলে টিকিট কাটতে। ভোম্বল অবশ্য কাউন্টার থেকেই খবর পায় আর মালিও জানায় — বড়া সাহেব পরশু বাহার যাবে।

— কোথায় যাবে জানো?

মালি বলে — নেহি মালুম। কালু বলছিল সাহেব নাকি দার্জিলিং যাবে।

ভোম্বল সেই খবরই আনে ব্রজকিশোরের কাছে। ব্রজ বুঝতে পা..র দার্জিলিং-এ তাহলে প্রিয়া আর বিজয় রয়েছে। কুলকিপ্রসাদও এখন ও'র বাগানে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। ব্রজকিশোর ফোনটা ধরে। ওদিক থেকে কুলকি প্রসাদ বলে,

— ব্রজকিশোর জী একটা খুশ খবর দিবার জন্য হামি গার্ডেন থেকে ফোন করলো।

ব্রজ জানে কিভাবে সাবধানে কথা বলতে হবে। তার জন্য সাংকেতিক ভাষাও আছে। কে জানে কেউ আবার লাইন ট্যাপ করছে কিনা। ব্রজ বলে,

— কি শেঠজী, এবার বাগানের প্রডাকসন রেকর্ড করেছে। নীলামে চায়ের দাম ভালো পেয়েছ নাকি।

কুলকি বলে — প্রডাকসন এখনও চলছে জী, মাল কেমন হবে ওটা পরে জানা যাবে। মালুম কে নীলামে ভালো দামই পাবো। আজ প্রিয়াকে দেখলাম। ভালোই আছে সে।

চমকে ওঠে ব্রজকিশোর।

— তাহলে প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছ? কোথায় আছে সে? কেমন আছে?

কুলকি বলে — আরে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? দেখলাম বেশ খুশ মেজাজেই আছে ওই ছেলেটার সাথে। আজ হাটে এসেছিল দুজন। গর্জে ওঠে ব্রজকিশোর।

— ওইখানে গিয়ে নষ্টামি করা হচ্ছে। উঠেছে কোথায়?

কুলকি বলে — সে পাতা ভি নিয়েছি। লেকিন শুন, ধর ফড় করে কোন কাজ করতে যেও না। পুলিশকেও ভি খবর দিও না — আমি নজর রেখেছি ওদের উপর। ওরা এখানেই রয়েছে। সামনে চা-বাগানের প্রডাকসন-এর ব্যাপার আছে। এইসাব ব্যাপার ভি আছে। ওসব চুকে যাক। তারপর তোমার ডিম পাড়া চিড়িয়া ভি ফেরত পাবে।

— এখন আমার এসব কাম করতে দাও।

ফোনটা কেটে যায়। ব্রজ ফোন রেখে বলে,

—প্রিয়ার খবর পাওয়া গেছে আর কুলকি বলছে আগে তার কাজ হয়ে যাক, তারপর ওকে ফেরৎ আনবে।

ভোম্বল বলে — ততদিনে ওরা যদি অন্য কোথাও চলে যায়।

ব্রজও সেই কথা ভাবছে। এদিকে তার বাঁচা মরার প্রশ্ন। দেরী হলে প্রিয়াকে নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই কি করবে এই ভাবনাতে পড়ে সে। কুলকি ভাবছে নিজের ব্যবসার কথা। বড় চালান আসার কথা। তাই এসব ঝামেলা সে এখন করতে চায় না। কিন্তু এটাই ব্রজকিশোরের কাছে সব থেকে বেশী জরুরী। একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে।

এই খবরের সত্যাসত্য সম্পর্কে ব্রজকিশোর সুনিশ্চত। তা নাহলে ওই কর্নেলও ওখানে যেত না। সে গিয়ে আবার সেখানে কি করবে কে জানে। ওই কর্নেল-এর জন্য সে নানাভাবে বিপদে পড়তে পারে। সে তার সর্বনাশই করতে চায়। তাই ব্রজকিশোরও চায় তাকে একটা কিছু করতে হবে। ওই কর্নেল কিছু করার আগেই। যাতে তার পরিকল্পনা ভেস্তে না যায়।

কুলকিপ্রসাদ কিছুদিন ধরে ব্যস্ত রয়েছে। ওপার থেকে বড় একটা চালান আসবে বিদেশী অস্ত্র বিস্ফোরক। তার জন্য প্রস্তুতি চলেছে। ওর লোকজনও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। ওরা এক এক দল এক একটা জায়গা অবধি মাল নিয়ে আসবে। তারপর অন্যদল সেগুলো আর কিছুটা বয়ে নিয়ে আসবে। তুলে দেবে অন্যদলের হাতে। যাতে একটা দল ধরা পড়লেও তারা অপরের হদিশ দিতে পারবে না।

এরজন্য বিভিন্ন পাহাড়ী বস্তিতেও ডেরা করা হয়। আর এদিকে এলে তা কুলকিপ্রসাদের চা বাগানের গুদামে ওঠে। তার চায়ের বাক্সও তৈরী থাকে। বাগানের ছাপমারা চায়ের বাক্স। তাতেই ওইসব মাল পুরে বাগানের চালানেই ট্রাকগুলো বের হয়ে যায় বিভিন্ন ঠিকানার।

অবশ্য তার জন্য পুলিশকেও মোটা টাকা দিতে হয়। কুলকি ওইসব কাজের মধ্যেও দেখে বিজয়-প্রিয়াকে। তারা যত্রতত্র ঘোরে। ওরা জানে না যে তাদের উপর নজরদারী শুরু হয়েছে।

প্রিয়া-বিজয় এখন স্বপ্নের রাজ্যে উধাও হয়েছে। এই তরুণ বয়সে ওরা পৃথিবীর মানুষের বহু নীচতা স্বার্থপরতাকে দেখেও সাবধান হয়নি। এই বয়স মানুষকে অসাবধানই করে তোলে।

কুলকি সেদিন ব্রজকিশোরও ভোম্বলকে তার বাংলোয় গাড়ি হাঁকিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়।

— তুমি? ব্রজকিশোর?

ব্রজকিশোর বলে — প্রিয়া এখনও এখানে আছে তো?

কুলকি বলে — হ্যাঁ হ্যাঁ। ওদের উপর নজর ভি রেখেছি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বড় চালান আসবে। কোটি টাকার ব্যাপার। কলকাতায় ভি সব ব্যবস্থা করতে হবে আর এসময় তুমি চলে এলে ব্রজ।

ব্রজকিশোর বলে — দু'একদিন থেকেই ফিরে যাবো প্রিয়াকে নিয়ে। তোমার সব কাজ ঠিক ঠাকই হবে। আমার কাজটাও করে দাও। প্রিয়াকে দরকার। ওকে পেলেই ফিরে যাবো।

কুলকিও ভাবছে কথাটা। প্রিয়াকে নিয়ে যদি ব্রজ খুশী হয়, তার কাজ ঠিক ঠাক করে, তাহলে তাই করবে সে। কুলকির কাছে এটা তেমন কঠিন কাজ কিছুই নয়। কুলকি বলে,

— তাই হবে ব্রজ। একটা কেন, আমার লোকজন ওই জোড়াটাকেই উঠিয়ে নিয়ে আসবে।

ভোম্বল একথা শুনে বলে — দারুণ হবে পিসা। ওই ছেলেটাই যত নষ্টের মূল। ওটা টিকে থাকলে ফের ঝামেলা করবে। তাই ছেলেটাকে ধরে এনে খতম করে দিলে ল্যাটা চুকে যাবে। প্রিয়ার প্রেমেরও সমাধি হয়ে যাবে। দুটোকেই তুলে আনুন। অল ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

ব্রজকিশোরও সবদিক ভেবে বলে — তা মন্দ নয়। পথের কাঁটা সাফ করাই ভালো।

কর্নেলও আসছেন দার্জিলিং মেলে। এসি ফাস্ট ক্লাশে আসছেন তিনি। ছনু-কালুও রয়েছে একটা সেকেন্ড স্লিপার কোচে।

ব্রজকিশোর ভোম্বলকে নিয়ে ওই ট্রেনেই চলেছে। ওরাও রয়েছে অন্য একটা এসি কোচে। ছনু-কালুও প্লাটফর্মে নেমে বিড়ি পান কিনতে ব্যস্ত। ছনুর নেশা জর্দা দেওয়া পান। খসবুদার জর্দাও চাই। হঠাৎ ওরা দেখে ভোম্বল আর ব্রজবাবুকে। কালু বলে — ছনু ওই মাল দুটোও যাচ্ছে ওই ট্রেনে। ছনুও দেখছে। বলে — তাইতো দেখছি। কোথায় ওঠে দ্যাখ। বড় সাহেবকে খবর দিতে হবে।

ওরাও দেখে পাশের কামরাতেই উঠছে ব্রজকিশোর। কর্নেল তার কামরায় কালুকে ঢুকতে দেখে বইপড়া বন্ধ করে চাইলেন। কালুও এগিয়ে এসে বলে,

— স্যার, ব্রজবাবু আর তার সেই মোটকা ভোম্বলবাবুকে দেখলাম পাশের কামরাতেই উঠেছে। ওরাও যাচ্ছে এই ট্রেনে।

কর্নেলের অঙ্ক মিলে যাচ্ছে। উনিও এবার বুঝেছেন ব্রজকিশোর নিশ্চয়ই কুলকিপ্রসাদের চা বাগানেই চলেছে। কিন্তু ওরা কি প্রিয়ার খবর পেয়েছে না কুলকির সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছে। তাদের গোপন ব্যবসার ব্যাপারে? হয়তো কোন মালপত্রও আসছে বাইরে থেকে তাই চলেছে।

কর্নেল বলে — ভালোই করেছিস খবরটা দিয়ে। শোন, ভোম্বল তোদের চেনে। তোরা সাবধানে থাকবি ও যেন তোদের না দেখে। তোরাই আড়াল থেকে নজর রাখবি নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে ওদের উপর।

কালু বলে — তাই হবে স্যার।

সেইমত কর্নেল নিউজলপাইগুড়িতে ট্রেন থেকে একটু দেরী করেই নামেন। বরং তার কামরা থেকে দেখেন ব্রজবাবু ভোম্বলকে নিয়ে ওভারব্রীজ পার হয়ে বাইরে চলে গেল। বাকী খবরটা দেয় কালুই।

— স্যার, ওরা একটা ট্যাক্সিতে করে মিরিকের ওদিকের কোন চা বাগানে গেছে।

কর্নেল নিশ্চিন্ত হন। ওরা কুলকিপ্রসাদের চা বাগানেই গেছে। অর্থাৎ দুই টপ ডন এবার পরামর্শ করে বহু টাকার বিদেশী মাল এনে দেশের শত্রুদের হাতেই তুলে দেবার প্ল্যান করেছে।

কর্নেল সমরজিৎকে এখানের ইস্টার্ন কমান্ডের চার্জ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কারণ ফোর্ট উইলিয়াম থেকেও এখানের অফিসে জরুরী সব নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র আসতে পারে তার রুট ম্যাপ ও অন্যসব খবরও হয়তো থাকবে এখানে। আর কর্নেলকেও এখানে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে, যাতে এখানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করা যায়। কারণ প্রতিপক্ষও চতুর ধুরন্ধর। তাদের মোকাবিলা করতে হলে সুষ্ঠ পরিকল্পনা মতই কাজ করতে হবে।

কর্নেল এর জন্য ডিফেন্স থেকে গাড়ি, একজন অফিসারও এসেছেন। কর্নেল ছনু-কালুকে একটা হোটেলে রেখে ওদের সঙ্গে চলে গেলেন। বলেন, ছকু তোরা এখানে থাক। খাওয়া দাওয়া করে হোটেলেই থাকবি। আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরবো।

কর্নেল-এর মধ্যে মিঃ রায়ের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছেন। মিঃ রায়ও বাগানের অফিসে কর্নেলের ফোন পেয়ে খুশী হন। বলেন — কখন আসছেন? তাহলে গাড়ি পাঠাবো।

কর্নেল বলেন — তার দরকার হবে না। আমি নিজেই এখানের কাজ সেরে চলে যাবো। আর একটা কথা, আমি যে এসেছি বা ওখানে যাচ্ছি এসব কথা কাউকে জানাবেন না। এমনকি বিজয়-প্রিয়াদেরও বলবেন না। মিঃ রায় অবাক হন। — মানে?

কর্নেল বলেন — হ্যাঁ। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। এটা অন্যদের জানাবেন না।

মিঃ রায় একটু অবাক হন। কিন্তু বলার কিছুই নেই।

প্রিয়া-বিজয় দুজনে বের হয়েছে বনের ওদিকে। নদীর ধাবে বুকভোর উঁচু ঘাসবন।

ব্রজকিশোর ভোম্বল সেদিন বের হয়েছে বাগানে। বাগানের ওদিকে একটা পাহাড় মাথা তুলেছে। ওদিকে এখন ঘন বন। পাহাড়ী-নদীটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

হঠাৎ গানের সুর শুনে চমকে ওঠে ভোম্বল। এদিক ওদিক চাইছে। দেখে পাহাড়ের নীচে নদীর ধারে বিজয় আর প্রিয়াকে। ওরা যেন মুক্ত বিহঙ্গের মত এই সবুজে হারিয়ে গেছে। ব্রজবাবুও দেখেছে।

ভোম্বল বলে — ওই যে ওরা পিসেমশাই।

এখান থেকে ওই নীচে পৌঁছানো যাবে না। তবু দেখা যায় ওদের। ভোম্বল বলে -- বন্দুক থাকলে ব্যাটাকে গুলি করে শেষ করতাম।

ব্রজবাবুও এবার ভাবনাতে পড়েছে। বেশ বুঝেছে যে ওদের প্রেম অনেক দূরই গড়িয়েছে। এখুনিই কিছু একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আর করার কিছুই থাকবে না। কিন্তু কুলকি প্রসাদের সাহায্য ছাড়া কিছু করাও যাবে না। কুলকিকেই বলতে হবে।

অবশ্য কুলকিপ্রসাদও ব্রজবাবুকে চটাতে চায় না। তাকেও দরকার। তাই ওই প্রিয়াকেই সে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করেছে। আর ওই ছেলেটাকেও। কুলকির লোকজনও বিজয়দের উপর নজর রেখেছিল। ওদের ওই নির্জন নদীর ধারে পেয়ে এবার কুলকির লোকজন এসে হানা দেয় হঠাৎ।

বিজয় প্রিয়াও তৈরী ছিল না। এখানে এসে এতদিন ধরে তারা যত্রতত্র ঘুরেছে। কোন বাধার মুখোমুখি হয়নি। আজ হঠাৎ এইভাবে তাদের উপর আক্রমণ আসবে তাও ভাবেনি। লোকগুলো প্রিয়াকে ধরেছে। বিজয়কে আক্রমণ করে। প্রিয়া চীৎকার করছে। বিজয়ও বাধা দেবার চেষ্টা করে। ওরা ততক্ষণে প্রিয়াকে ওদিকে রাখা জিপ তুলেছে। কিন্তু বিজয় মরীয়া হয়ে আক্রমণ করেছে ওদের। লোকগুলো ভাবতে পারেনি যে ছেলেটার এত শক্তি সাহস রয়েছে বিজয়কে তারা ধরতে পারে না। বরং বিজয়ই তাদের দু'একজনকে আহত করে জিপের দিকে ছুটে যায় প্রিয়াকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু জিপটা তখন বেগে বের হয়ে গেছে।

বিজয় নিস্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। আহত লোকগুলোও এই সুযোগে পালিয়েছে। উপর থেকে ভোম্বল বলে যে — ঠিক হয়েছে।

ব্রজ বলে — না। মোটেই ঠিক হয়নি। ওই হারামজাদা যে রয়ে গেল

ভোম্বল বলে — প্রিয়াকে তো হাতে পেয়েছেন। মরুক ওই ব্যাটা। এবার বেঁচে গেছে। ফের গড়বড় করলে আজই ওকে ফিনিস করে দেব।

ব্রজকিশোর এবার প্রিয়াকে হাতে পাবে, এই আশাতেই ফেরে বাংলোতে

এখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। এখানে সন্ধ্যা নামে একটু আগেই কারণ পাহাড় ঘেরা এলাকা। চারদিকেই বেশ কিছু পাহাড় মাথা তুলেছে মিঃ রায় বাগান থেকে বাংলোতে ফিরেছেন। তখনও বিজয়-প্রিয়া ফেরেনি বাংলোর গাছগাছালিতে ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব ওঠে। মিঃ রায়ও চিন্তায় পড়েন।

কদিন থেকেই দেখছেন এই এলাকাতে বেশ কিছু অজানা লোকের গতিবিধিও বেড়েছে। রাত গভীরে ওই সীমান্তের বন পাহাড়ে জোরালো আলোর ঝলকও ওঠে। কুলকিপ্রসাদের বাগানেও ব্যস্ততা নেমেছে। চা বাগানে সকালেই চা পাত্তি তোলার কাজ শুরু হয়। দিনভোর সেইসব চা পাতা বড় বড় চৌবাচ্চায় ভেজানো হয় আর রাতে চালু হয় চায়ের কারখানা। সেখানে পাতাগুলোকে দলে পিষে সবুজ চায়ের দানায় পরিণত করা হয়। তারপর বৈদ্যুতিক চুল্লিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় তাদের সেঁকে চা কণিকায় পরিণত করে তারপর বাজারে চালান দিতে হয় বাক্সে পুরে।

ওই কাজই এখন শুরু করেছে কুলকিপ্রসাদ। মাল তৈরীর কাজ যে চার

আছে, সেটাই দেখাতে ব্যস্ত সে। এটা তার একটা কৌশল মাত্র। এই কাজের নাম করেই বহু অসামাজিক কাজ করে রাতের অন্ধকারে।

প্রিয়া বিজয় তখনও ফেরেনি। হঠাৎ দেখা যায় বিজয়কে, একাই ফিরছে সে। আহত-জামায় রক্তের দাগ।

মিঃ রায় অবাক হন।

— একি! প্রিয়া কোথায়?

বিজয় খবরটা জানাতে মিঃ রায় চমকে ওঠেন।

— সেকি! প্রিয়াকে কারা জোর করে তুলে নিয়ে গেল? তাদের কাউকে চেনো তুমি?

বিজয় তাদের কাউকে চেনে না। তবে লোকগুলো যে পেশাদার গুণ্ডা, সেটা বুঝতে তার দেরী হয়নি। মিঃ রায় বলেন,

— তাহলে কারা তুলে নিয়ে গেল প্রিয়াকে?

বিজয়ও ঠিক বুঝতে পারে না। এখানে তো তাদের কোন শত্রু নেই। তাহলে কারা এসব করেছে? মিঃ রায় বলেন — থানায় চলো। কিছুদিন ধরে এই এলাকায় বেশকিছু অচেনা লোকের ভিড়ও দেখছি। এসব নিশ্চয়ই কোন কুখ্যাত দলেরই কাজ।

থানা কয়েক কিলোমিটার দূরে বড় রাস্তার উপর। এখানে শহর বাজার রয়েছে। আশেপাশের পাহাড় বনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নির্জন চা বাগান, এমনকি সীমান্তের পাহারার কিছুটা ভার রয়েছে এদের উপর।

কুলকিপ্রসাদ এখানের সুপরিচিত ব্যক্তি। চা বাগান মালিকই নয়, অন্যসব ব্যবসাও করে লোক চক্ষুর অন্তরালে। তাই রাতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ভালোই আছে। সেই কারণে তারা শেঠজীর কথার গুরুত্ব একটু বেশীই দেন। মিঃ রায়কে থানায় আসতে দেখে অফিসার ইন চার্জ চাইলেন। সঙ্গে বিজয়। মিঃ রায় বলেন,

—আমার এক আত্মীয়া এখানে আমার বাংলোতে ছিল। এই আমার ভাইপো। দুজনে বেড়াতে বের হয়েছিল নদীর ধারে। হঠাৎ কিছু গুণ্ডা চড়াও হয়ে প্রিয়াকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। বিজয়ও বাধা দিতে গিয়ে চোট পেয়েছে।

অফিসার দেখছেন ওদের। মিঃ রায়কেও চেনেন তিনি। অফিসার তাই ওদের একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারে না। বলে — ডায়রী করছি। তদন্তও হবে।

মিঃ রায় বলেন — মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। এদিকে আগে এসব হয়নি। কিছুদিন থেকে দেখছি রাতের অন্ধকারে গাড়ি, লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে। বর্ডারের দিকেও যাতায়াত করে কারা।

অফিসার একটু যেন বিপদে পড়েছেন। কুলকিপ্রসাদের বাগানের ওদিকেই বর্ডার। অফিসার বলেন,

— আমরা দেখছি স্যার। মেয়েটির ছবি যদি পেতাম। বিজয় প্রিয়ার ছবিও এনেছিল। সেই-ই একটা ছবি দেয় অফিসারকে। অফিসার দেখছে বিজয়কে। মিঃ রায় বলেন,

— একটু চেষ্টা করুন। আমরাও খুঁজছি। বেড়াতে এসে এইভাবে বিপদে পড়বে এটা ভাবিনি।

থানা থেকে বেরিয়ে মিঃ রায়, বিজয় বাংলোয় ফিরেছে। প্রিয়ার কোন খবর নেই। তখন রাত হয়েছে। গাছগাছালির বুক চিরে জোরালো আলো ফেলে একটা গাড়ি আসতে দেখে মিঃ রায় বিজয় বাংলো থেকে নেমে আসে। মনে হয় পুলিশ এর মধ্যে হয়তো কোন খোঁজই পেয়েছে প্রিয়ার। কিন্তু দেখে জিপ থেকে নামছেন কর্নেল সমরজিৎ সঙ্গে ছনু আর কালু। মিঃ রায় ওকে চেনেন না। বিজয়ই যায়।

— আঙ্কেল আপনি?

কর্নেল এগিয়ে অসে — হ্যাঁ। নমস্কার। আপনিই মিঃ রায়? আমি কর্নেল সমরজিৎ সেন। কি ব্যাপার বিজয়? সব কেমন চুপ চাপ। প্রিয়াকে দেখছি না।

বিজয় বলে — স্যাব, আজ বৈকালে নদীর ধারে বেড়াতে গেছিলাম। সেখান থেকে কারা জোর করে প্রিয়াকে তুলে নিয়ে গেছে। বাধা দিতে গেছিলাম — পারিনি। ওরা দলে ভারি ছিল।

কর্নেল চমকে ওঠেন — মাই গড! প্রিযাকে তুলে নিয়ে গেছে!

বিজয় বলে — ওরা আমাকেও ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। কর্নেল কি ভাবছেন। আগেই দেখেছেন তিনি ব্রজকিশোরকে। সে এদিকেই এসেছে। আর এবার কর্নেল বুঝেছেন ব্রজকিশোর প্রিয়ার খবর পেয়েই এসেছে এখানে। এখানে ওর দলবলও আছে। তাদের দিয়েই এই কান্ড করিয়েছে।

কর্নেল বলেন — এমনই একটা কিছু হবে মনে হয়েছিল। মিঃ রায় — আপনি কুলকিপ্রসাদকে চেনেন? কাছেই ওর চা বাগান।

মিঃ রায় বলেন — হ্যাঁ, ওর নামে তো অনেক কিছুই শুনি। কলকাতাতেও ওর যাতায়াত আছে। সেখানেও কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসাও আছে।

— সেই ভদ্রলোককে চেনেন? কর্নেল শুধান।

— না। তবে শুনেছি তিনিও এখানে মাঝে মাঝে আসেন। ওই পাহাড়ের নীচে নদীর ধারে কুলকির বাংলো-আউট হাউস। ওখানেই ওঠেন।

ছনু-কালুও শুনছে ব্যাপারটা। সেই মেমসাহেবকেই কারা ধরে নিয়ে গেছে আর কর্নেলের কথাতে বুঝেছে এসব ব্যাপারে যেন ওই কুলকিপ্রসাদ না কার হাতও থাকতে পারে।

কর্নেল বলে — থানাতে খবর দিয়েছেন?

— হ্যাঁ।

কর্নেল সেলফোনটা বের করে ডায়াল করতে থাকেন জেলার সদর দপ্তরে। বেশ বুঝেছেন এখানের থানার সাধ্যও সীমিত। তাই জেলা সদরেই ফোন করেন।

কুলকিপ্রসাদই খবরটা দেয় ব্রজকিশোরকে।

— তোমার সোনার ডিম পাড়া চিড়িয়াকে পাকড়ে এনেছি বস। ব্রজবাবু গেস্ট হাউসে রয়েছে। এখানের কাজ সেরে কবে ফিরতে পারবে জানে না। ওদিকে বর্ডার থেকে ম্যাসেজ এসেছে, লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা তারা জানতে চাইছে। ওদিকে মালপত্র এসে গেছে। এবার পাচার করার দরকার। লাইন ক্লিয়ার পেলেই তাদের অপারেশন শুরু হবে। কুলকিও এখন ব্যস্ত। এদিকের পথও সাফ করে রেখেছে সে এখানের লোকজনদের হাতে এনে। ওদিক থেকে অপারেশন শুরু হবে। এসব মাল এনে তোলা হবে কুলকির চা বাগানের সীমান্ত এলাকার একটা গুদামে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেইসব মহামূল্যবান মাল এদিকের নানা এজেন্টদের কাছে পাচার করে দেবে। বেশ কিছু মাল চলে যাবে কলকাতায়। তার জন্য ট্রাকও তৈরী থাকবে।

এই সময় কুলকি ব্রজকিশোরকে হাতে রাখার জন্য প্রিয়াকে তুলে এনেছে। ব্রজকিশোর খবরটা পেয়ে বলে,

— আর সেই ছেলেটা? তাকে ছেড়ে রেখে দিলে? কি লোকজন তোমার? এমন একটা আধ খেবড়ো কাজ করে! ছেলেটাই তো বিপদ করবে!

কুলকিও তা জানে। ব্রজকিশোর বলে,

— ছেলেটাকেও চাই। যে ভাবে হোক। আমার কাজ ঠিক মত করো। নাহলে তোমার জন্য এত করছি কেন।

কুলকি বলে — পরে হবে। সামনে এত কাজ!

ব্রজকিশোর বলে — না। ছেলেটাকেই দরকার। না হলে তোমার কাজও ঠিকমত করা যাবে না।

কুলকি জানে এসময় ব্রজকে তার খুবই দরকার। তাই বলে,

— ঠিক আছে দেখি কি করা যায়।

ব্রজ বলে — করতে হবে। ছেলেটাকে আনো। তোমার সব কাজ ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

কুলকিপ্রসাদ এসময় ব্রজকে চটাতে চায় না। অনেক মালের ভাগিদার ব্রজকিশোর। কুলকি তাই বলে,

— ঠিক আছে। পাবে ওই ছেলেটাকে।

মিঃ রায়ের বাংলো বেশ বড়ই। বাগানের একদিকে, বস্তি থেকে দুরে নির্জন নদীর ধারে ওর বাংলো। ওদিকে একটা ঘরে রয়েছে বিজয়। এদিকটা বেশ নিরিবিলি। গাছগাছালিও রয়েছে। তারপরই নদীর খাত। ওপারে উঠে গেছে পাহাড় সীমা।

বিজয় রাতে ওর ঘরে রয়েছে। প্রিয়ার কথা ভাবছে। প্রিয়াও হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। এমনি রহস্যময় ভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। হঠাৎ তার ঘরে দু-তিনজন ছায়ামূর্তিকে দেখে চাইল। তারা বোধহয় জানালা দিয়েই ঢুকেছে। সাবেকী আমলের বাংলো। জানলায় শুধু কাঁচের পাল্লা। গ্রীলও নেই। বিজয় ওঠবার আগেই দুজন লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তীব্র কি — গন্ধমাখা রুমাল চেপে ধরতে বিজয়ের চোখের সামনে কেমন অন্ধকার নামে। সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। তারপর আর বিজয়ের কিছুই মনে পড়ে না।

ছনু-কালু এসেছে কর্নেলের সঙ্গে। বাংলোর ওদিকে আউট হাউসের একটা

ঘরে রয়েছে ওরা। এখানে মদের অভাব নেই। ছনু-এর মধ্যে বাংলোর দারোয়ানকে বলে দুটো বোতল সংগ্রহ করে তখন সেবায় ব্যস্ত।

ওদেরও অভ্যস্ত চোখ। রাতের অন্ধকারে ওরা যেন দেখতে পায়। কারো পায়ের শব্দও শুনতে পায় সহজে। হঠাৎ ছনু দেখে কজন ছায়ামূর্তি কি যেন ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। কালুও দেখেছে। ওরাও বুঝেছে নিশ্চয়ই কিছু নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কোথায় যায় দেখার জন্য ছনু-কালুও বের হয়ে আসে।

দেখে ওদিকে একটা গাছের নীচে পুরানো ট্রাকও রয়েছে। পিছনে ক্যানভাসের ছাউনি দেওয়া মালপত্রও কিছু রয়েছে। লোকগুলো ওদিক থেকে গাছের আড়াল দিয়ে আসার আগেই ছনু কালুও গিয়ে ট্রাকটাতেই উঠে পড়ে। চায়ের বাক্স - বস্তা - চটের স্তূপও রয়েছে। তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে দুজনে। দেখে অন্ধকারে ওরা কি একটা বস্তুকে এনে পিছনের ওই চটের গাদায় ফেলে ডালাটা বন্ধ করে বলে,

— থাক্, শালা। নিয়ে চল ওটাকে।

ওরা বের হয়ে গেল ট্রাক নিয়ে। ছনু-কালু এবার দেখে একটি তরুণকেই তুলেছে ওরা। পথে আলো তেমন নেই। দুদিকে চায়ের বাগান। ওর মাঝে কারখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় বাইরে থেকে আসা এক ঝলক আলোয় ওরা চিনতে পারে।

— এতো বিজয় সাব। ছনু বলতে যাবে। কালু ওকে ইশারায় থামিয়ে দেয়। ওরাও এবার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। কেউ বিজয় সাহেবকে তুলে নিয়ে চলেছে কোন বদ মতলবে। অবশ্য ছনু কালু ঘটনার পশ্চাৎপট জানে। ব্রজকিশোরকেও দেখেছে এখানে আসতে। আর শুনেছে মেম সাহেবকে কারা তুলে নিয়ে গেছে। এখন মনে হয়, তারাই প্রথমে না পেরে, পরে এসে নিয়ে যাচ্ছে বিজয়কেও।

ট্রাকটা চলেছে বড় রাস্তা ছেড়ে অন্য বাগানের মধ্যে দিয়ে। একটা ঝোরার পুল পার হয়ে আরও নির্জন সরু পথে চলেছে। ওদিকে একটা বড় শেড। ট্রাকটা এসে তার সামনে দাঁড়াতে কয়েকজন লোক বিজয়ের জ্ঞানহীন দেহটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ট্রাকটা বোধহয় এখানেই থাকে।

লোকগুলোও নেমে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার ছনু-কালু বের হয়। জায়গাটা দেখে তারা। একটা বড় গুদামই। ওদিকেও দু'একটা

শেড রয়েছে। লোকজন বিশেষ কেউ নেই। ওপাশে একটা মিটিমিটি বালব্ জ্বলছে। সেই ছাউনির নীচে দুজন সেন্ট্রিকে দেখা যায়। ছনু-কালুও আশপাশ দেখে নেয়।

কালু বলে — পথ চিনে যেতে পারবি তো?

ছনুর চোখ খুব তীক্ষ্ণ। বলে সে,

— পথের নিশানাও দেখেছি। এখান থেকে বেরিয়ে সেই ঝোরার পুল পথ পার হয়ে ডাইনে গেলে বড় রাস্তা। দুজনে ছায়ান্ধকারে মিলিয়ে যায়।

প্রিয়াকে ওরা বিকাল বেলাতেই তুলে এনে এই বনপাহাড়ের মধ্যেকার গুদামে এনে রেখেছে। এদিকে লোকজন বিশেষ আসে না। প্রিয়াকে ওরা ওদিকের কোন চালু গুদামে রাখেনি। এই সীমান্তের বড় গুদামে মাঝে মাঝে মালপত্র আসে। আবার পাচার হয়ে যায়।

প্রিয়া প্রথমে বুঝতেই পারেনি কেন তাকে ধরে আনা হয়েছে এখানে। লোকগুলোকে সে শুধায়,

— কেন? কেন ধরে আনলে? কেন?

তারাও জানে না। ওরা শুধু হুকুম তামিলই করেছে।

তাই বলে — নেহি মালুম। শেঠজীসে পুছো।

ওরা ওকে রেখে চলে যায়। অবশ্য অন্যলোকও রয়েছে গুদামে। তাদের হাতে বন্দুক। ওদিকে গুদামে বেশ কিছু বাক্স, বড় বড় পেটিও রয়েছে। আর এসব বিদেশ থেকেই আসা, তা দেখলেই বোঝা যায়।

কুলকিপ্রসাদ নিজের কাজটা আগে শেষ করতে চায়। আর তারপরই ওসব মাল দু'একদিনের মধ্যে চায়ের পেটির ছাপমারা বাক্স করে ট্রাক বন্দী হয়ে কলকাতায় চলে যাবে ব্রজকিশোরের গুদামে। আজ রাতেই বিদেশ থেকে চালান আসবে। কোটি-টাকার মাল। কুলকি তার লোকজনদের নিয়ে ব্যস্ত। পাহাড় বনের পথে মাল আসবে। বিভিন্ন পথ দিয়ে মাল আসবে। একটা পথে নয়। অর্থাৎ, একটা পথের মাল ধরা পড়লেও অন্যপথের মাল নিরাপদেই এসে পৌঁছাবে।

ব্রজকিশোর গেস্ট হাউসে রয়েছে। ভোম্বলও। কুলকির এসব অপারেশনের খবর সেও জানে না। কুলকিপ্রসাদও তার ব্যবসার এসব গোপন খবর

কাউকে জানাতে চায় না। ব্রজকিশোর দেখেছে কুলকিও তার লোকজনদের নিয়ে ব্যস্ত। রাতেই বের হয়ে গেল তারা।

কুলকিই বলে — ব্রজবাবু, তোমার একটা চিড়িয়াকে এনেছি। গিয়ে দেখা করো। আর একটা চিড়িয়াকেও পাকড়ে আনবে আমার লোক।

ব্রজকিশোর প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেই সন্ধ্যাতেই। ভোম্বলও এসেছে। প্রিয়া এবার ওদের এখানে দেখে বুঝতে পারে, কেন তাকে ধরে আনা হয়েছে। আর কারা ধরে এনেছে তাকে। প্রিয়া বলে,

— তাহলে এতদূর এসেছ আমাকে ধরার জন্য!

ভোম্বল বলে — এইভাবে বাড়ি থেকে চলে এলে! বাড়ির মান ইজ্জৎ নিয়ে কথা।

প্রিয়া বলে — আমার বাড়ির মান ইজ্জত নিয়ে খুব বেশী ভাবছো দেখছি।

ব্রজ চটে ওঠে — থাম তুই। লজ্জা করল না। একটা বাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে বাড়ি থেকে চলে এলি! এত নীচে নেমেছিস!

প্রিয়া বলে — এই ভোম্বলের মত অপদার্থ সে নয়। বিজয় অনেক ভালো ছেলে। আমারও ভালো মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে। আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দাও।

ব্রজকিশোরও বুঝেছে বিজয় ওর ঘাড় থেকে সহজে নামবে না। তাই এবার বিজয়ের ব্যবস্থাই করে যেতে হবে তাকে। ওটাকে ধরে এনে এখানেই শেষ করে যাবে। প্রিয়ার সামনেই। তারপর প্রিয়াকে নিয়ে যাবে এখান থেকে রাহু মুক্ত করে।

ব্রজ বলে — সেটাকে ধরে এনে তোর সামনেই শেষ করে দেব। প্রেম পীরিত করা ঘুচিয়ে দেব। তারপর তোর ব্যবস্থাই করবো। থাক এখানে পড়ে।

প্রিযার এবার ভয় হয় ওর কথায়। সত্যিই যদি বিজয়ের কোন বিপদ হয়! কাকার হাত যে এখানে এসে পৌঁছাবে তা ভাবেনি। তাই বলে,

—যা করার আমার উপরই করো। তার কি দোষ?

— দোষ নয়! সে ব্যাটা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িয়েছিল। তাই তাকেও শেষ করে রেখে যাবো।

ওরা চলে যায়। প্রিয়াকে একা আটকে রেখেছে। একজন খাবার আনে। রুটি আর সবজী। লোকটা সিটকে চেহারার। চোখ দুটো পিটপিট করছে

সাপের মত। প্রিয়া রুটি সবজীর থালাটা ওর বুকেই ছুঁড়ে মারে। ছত্রাকার হয়ে ছিটিয়ে পড়ে খাবারটা। লোকটা বলে,

— থাকো, না খেয়ে। এখানে তেজ দেখালে কোই ফায়দা হবে না মেমসাব। কুলকিপ্রসাদজীকে চেন না।

লোকটা চলে যায়। প্রিয়া, কুলকিপ্রসাদের নাম জানে। এবার বুঝেছে কাকাবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগটার কথা। কুলকি সাংঘাতিক লোক।

রাত নেমেছে। প্রিয়ার ঘুম আসে না। হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে চাইল। হয়তো কাকাবাবুই ফিরেছে। কিন্তু তা নয়। লোকগুলোর সঙ্গে হাত বাধা অবস্থায় বিজয়কে দেখে চাইল। বিজয়ের তখনও জ্ঞান নেই। লোকগুলো বিজয়কে চটের গাদার উপর ফেলে রেখে বলে,

— শালা হুঁস ফিরলে বুঝবে কোথায় এসেছে। এখন চল। শেঠজীর জরুরী দরকার আছে। পরে এদের খবর নেব। প্রিয়া দেখে মাত্র। লোকগুলো চলে যেতে প্রিয়া এগিয়ে আসে বিজয়ের কাছে। ওকে ডাকছে ব্যাকুল কণ্ঠে। কিন্তু বিজয়ের কোন হুঁসই নেই।

আজ প্রিয়া বুঝেছে, বিজয়ের সমূহ বিপদ। কাকাবাবু, শেঠ কুলকিপ্রসাদ ওকে শেষ করবে। তাই প্রিয়া ওর জ্ঞান ফেরাবার জন্য মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে। প্রিয়া আজ বিজয়ের এই বিপদে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কর্নেল সন্ধ্যা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওদিকে বর্ডারের আশেপাশে ফোর্সও মজুত করা হয়েছে। ডিফেন্সের লোকজন মোবাইল ভ্যানে বনের মধ্যে ওঁৎ পেতে আছে। কর্নেল আজ যেন এতদিন পর করার মত একটা কাজ পেয়েছেন। এতদিন ধরে বনে পর্বতে তিনি তার সৈন্যদল নিয়ে বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মোকাবিলা করেছেন। তাদেব বিদ্ধস্ত করে দেশের মাটি থেকে তাড়িয়েছেন। আজ আবার তেমনি এক শত্রুদলের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এরা প্রকাশ্যে নয় চোরের মত রাতের অন্ধকারে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের মানুষের সর্বনাশ করতে চায়।

ওয়ারলেসে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে কুলকির আস্তানা থেকে, ওদিক থেকে বিদেশীরা জানাচ্ছে মাল যাচ্ছে। সাংকেতিক ভাষায় ওদের কথা চলছে। মোবাইল ভ্যানের রিসিভারে সেইসব তথ্য রেকর্ড করা হচ্ছে।

আর কর্নেলই একজন ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই পথগুলো সিল

করতে। অবশ্য কুলকিও সতর্ক রয়েছে। বেশ কিছু মাল অন্যপথে এসেছে। সেগুলো ওর লোকজন রাতের অন্ধকারে খালাস করে গুদামে নিয়ে গিয়ে রাখছে।

কুলকিও খুশী। তার মনে হয়, অন্য কেউ তাদের এই চালানের খবরও জানে না। কিন্তু হঠাৎ গুলির শব্দে পাহাড়, বন কেঁপে ওঠে। চমকে ওঠে শেঠজী তার গাড়িতে। দূরে কোন পাহাড়ের দিক থেকে এস-এল-আর-এ কর্কশ গর্জন ওঠে। এরাও জবাব দেয়। কুলকির কিছু মাল ধরা পড়ে যায়। কয়েকজন লোকও। কিন্তু কুলকির আসল মালপত্র অনেক এসে গেছে। সেগুলোর খবরও পায়নি ওরা।

কর্নেল সমরজিতের কৌশলেই, মেসেজ ট্যাপ করে ধরা পড়ে ওই মালপত্র।

খবরটা কুলকিও পেয়ে গেছে। এতদিন ধরে মালপত্র আনছে সে। কিন্তু কখনও বিপদে পড়েনি। নিরাপদে গোপনেই মাল সমেত ধরা পড়ে গেছে। কুলকি বুঝেছে, ওই লোকগুলো যারা ধরা পড়েছে, তাদের কাছ থেকেই হয়তো পুলিশ গোপন ডেরার খবর পেতে পারে। অবশ্য কুলকির নেটওয়ার্ক খুবই শক্ত পোক্ত। ওই লোকগুলো শুধু মাল বয় মাত্র। তারা এই ডেরার সঠিক খবর জানে না। তারা এক জায়গা থেকে মাল নিয়ে অন্য এক জায়গায় পৌঁছে দেয় বনের মধ্যে। তবু কুলকি সাবধান হতে চায়। ওই গুদামের মাল এই রাতেই সে ট্রাকে তুলে কলকাতায় পাচার করে দেবে। তাই ব্রজকিশোরকেও যেতে হবে কলকাতায়।

কুলকি এর মধ্যে জেনেছে সেই ছেলেটাকেও তুলে এনেছে তার লোক। তাই এবার ব্রজকে সে মালপত্র আর ওই ছেলে মেয়ে সমেত পাচার করে দেবে এই রাতেই। তাই সে ওই রাতে গেস্টহাউসে এসে ব্রজকে বলে,

--- ব্রজবাবু, প্রোগ্রাম কিছু বদলে গেছে। এই রাতেই মাল যাবে কলকাতায়। তুমিও তোমার চিড়িয়াকে নিয়ে বার হয়ে যাও।

ভোম্বল বলে — তাই চলুন পিসেমশাই।

ব্রজকিশোর বলে — ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে? ওটাকে —

ভোম্বল বলে -- ওটাকে ফুটিয়ে দিতে বলো শেঠজীকে। ওকে ওদের হাতে দিয়েই চলো। কেটে পড়ি আমরা প্রিয়াকে নিয়ে। মরুক ব্যাটা বিজয়।

বিজয়ের জ্ঞান ফিরেছে। প্রিয়াকে দেখে বলে,

— এখানে এলাম কি করে?

প্রিয়া বলে — তখন ওরা পারেনি, পরে তোমাকে বাংলো থেকে তুলে এনেছিল।

এবার বিজয়েরও মনে পড়ে সব ঘটনাটা। সেও বুঝেছে যে, তাদের শেষই করবে। বিজয় বলে,

— যেভাবে হোক এখান থেকে বের হতেই হবে প্রিয়া।

প্রিয়া পাহারাওয়ালা দুজনকে দেখিয়ে বলে

— কাকাবাবুরই কাজ এসব। ওই কুলকিপ্রসাদ আর ও মিলে কি সব বেআইনী ব্যবসাই করে। ওদের হাত অনেক লম্বা বিজয়। এখানে অবধি এসেছে আমাদের সন্ধানে। হয়তো ওরা তোমাকেই শেষ করতে চায়। এ আমি হতে দেব না।

বিজয়ও বুঝেছে এবার বিপদের গুরুত্ব। তাই এই বিপদের মুখে সেও মরিয়া হয়ে ওঠে। গুদামের ওদিকে কিছু রড পড়ে আছে। বিজয় নিজে একটা নেয়। অন্য একটা দেয় প্রিয়াকে। বলে বিজয়,

— বাঁচার জন্য তবু লড়াই করতেই হবে প্রিয়া। কোনমতে এখান থেকে বের হয়ে বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে পালানো যেতে পারে। সেই চেষ্টাই করতে হবে।

— কিন্তু ওই দুজন?

বিজয় বলে — একটা পথ হতে পারে। যা বলি শোন।

পাহারাদারদের দুজনের হাতে বন্দুক। বিজয় দেখছে যদি একটা বন্দুক হাতে পেতো, সে ওদের সঙ্গে লড়তে পারতো। কর্নেল সাহেবের কাছে সুটিং-এর তালিমটাও কাজে লাগাতে পারতো।

পাহারাওয়ালা দুজন বাইরে ভিতরে সর্বদা নজর রেখেছে। বিজয় জ্ঞানহীন অবস্থাতেই পড়ে থাকার ভান করে চলেছে। ওদিকে হঠাৎ প্রিয়া একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুদামের মধ্যে নানা জিনিসের বাক্স-প্যাকেট ছড়ানো। ওর মধ্যে সাপ থাকা অসম্ভব নয়। প্রিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করে।

— সাপ - সাপ কামড়ে দিল। ওরে বাবা!

পাহারাওয়ালা দুজন ছুটে আসে। প্রিয়া তখন পা চেপে ধরে আর্তনাদ করছে। পাহারাদারদের একজন ওর পা টা দেখবে, হঠাৎ বিজয় লাফ দিয়ে উঠে রড

দিয়ে সপাটে তাকে মারতে সে ছিটকে পড়ে। অন্যজন বন্দুক তোলার আগেই প্রিয়াই তার কপাল লক্ষ্য করে রড চালিয়েছে। আর বিজয় একজনের বন্দুকটাই তুলে নিয়ে প্রিয়ার হাত ধরে ওকে নিয়ে বের হয়ে যায় গুদাম থেকে।

বাগানের একপ্রান্তে গুদামটা। দু-একটা বাতি এদিক ওদিক জ্বলছে। একটুখানি এলাকার কিছু বুক সমান চা গাছের বাগান, তারপরই একটা ঝোরা পার হলেই বনের শুরু। ওরা দৌড়াচ্ছে বাগানের মধ্যে দিয়ে।

এমন সময় কুলকি ওর লোকজন - ব্রজবাবুও এসে পড়ে। ওদের মালপত্র একটা ট্রাকে উঠে পড়েছে। অন্য একটা গাড়িতে যাবে ব্রজকিশোররা। ওরা প্রিয়াকে নিতে এসেছে। হঠাৎ গাড়ির হেড লাইট পড়েছে প্রিয়া বিজয়ের উপর। কুলকি চমকে ওঠে, তার লোকজনও। দেখে প্রিয়া-বিজয় পালাচ্ছে। এবার কুলকিই গর্জে ওঠে,

— ভাগতা হ্যায় দেখো। চালাও গোলি।

ওরাও গুলি চালিয়েছে। বিজয়ও বিপদ বুঝে ওই বুকভোর চা বাগানে গাছের মধ্যে বসে পড়ে প্রিয়াকে নিয়ে। আর একটু দূরেই ঝোরাটা পার হলেই ঘন জঙ্গল। ওরা নিচু হয়ে এগোতে যাবে। কুলকির লোকজনও এবার ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। গুলি চালাচ্ছে। বিজয়ও ওদের উপর গুলি চালাচ্ছে। ভোম্বলই প্রিয়াকে ধরার জন্য লাফ দিয়ে নেমেছে। প্রিয়াকে হারাতে সে পারবে না। সে এগিয়ে গিয়েছিল, গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ে। পায়ে লেগেছে গুলিটা। আর্তনাদ করে ভোম্বল। দুদিক থেকে গুলি ছোড়া শুরু হয়। কিন্তু এদের গুলির অভাব নেই। বিজয়ের বন্দুকে মাত্র দুটো গুলিই ছিল। তাও শেষ। এবার কুলকির দলও ধরে ফেলে তাদের। প্রিয়াকে টেনে নিয়ে চলেছে। বিজয়কে ধরেছে ওরা। কে একটা আঘাত করতে বিজয় ছিটকে পড়ে। প্রিয়া আর্তনাদ করে,

—না। ওকে মেরো না। আমাকে মারো।

আহত বিজয়কে সে আগলে রাখতে চায়। ব্রজকিশোর গর্জন করে,

—টেনে তোল ওটাকে গাড়িতে। তোল। আর খতম করে দাও ওই ছোঁড়াটাকে কুলকি, যেন লাশের সন্ধান কেউ না পায়।

কুলকি বলে — তাই করছি। এ্যাই — গুদাম থেকে একটা টাইম বোম এনে ওকে আস্টেপিস্টে বেধে দম লাগিয়ে দে। দশ মিনিট সময় দিবি। পড়ে

থাকুক ও ওইখানে। দশ মিনিট পর উড়ে যাবে ওর হাড় গোড়। ওর নাম নিশানা মিটে যাবে।

— না। প্রিয়া চীৎকার করে।

ব্রজ ধমকে ওঠে — চুপ, একদম চুপ। না হলে কুলকি দুটোকেই একসঙ্গে বেঁধে বোম ফিট করে দাও। দশমিনিটের মধ্যে প্রেমের নাটক শেষ হয়ে যাবে। উড়িয়ে দে দুটোকে।

প্রিয়া বলে — তাই দাও। এমন শয়তানের রাজ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো।

— না প্রিয়া না। ব্রজবাবু, আমাকে যা খুশী করুন। প্রিয়াকে মারবেন না। দয়া করুন।

— দয়া! বাঁধ দুটোকেই। ব্রজ এবার বুঝেছে এভাবে দুটোকেই উড়িয়ে দিতে পারলে কোন প্রমাণই থাকবে না। সহজেই সে সব কিছুর মালিক হতে পারবে।

কুলকির লোকজনের এসব কাজ খুবই নিপুণ। ওরা এর মধ্যে টাইম বোম এনে এবার অপারেশন শুরু করেছে প্রিয়া-বিজয়ের উপর।

ছনু-কালুও বসে নেই। তারাও বনের মধ্যে থেকে গুদামের দিকে নজর রেখেছিল। কিন্তু এইসব কাণ্ড ঘটবে তা ভাবেনি। ওরাও বিপদের গুরুত্ব বুঝে এবার ছুটে এসেছে মিঃ রায়ের বাংলোয়।

এর মধ্যে কর্নেল সাহেবও মিলিটারীদের সঙ্গেই ওই পাহাড়ে অপারেশন সেরে ফিরেছেন। দলের পাণ্ডাদের ধরতে না পারলেও সাংঘাতিক কিছু মালপত্র ধরা পড়েছে আর কয়েকজন লোকও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এবার মিলিটারী পুলিশ ওদের পেট থেকে ঠিক গোপন খবর বের করবে। কালই তারপর যা দরকার করা হবে।

খুশী মনে বাংলোয় ফিরে কর্নেল শোনেন প্রিয়া-বিজয়ের খবরটা। কর্নেল বলেন,

— এ ওই গ্যাং-এরই কাজ। বিজয়রা হয়তো কিছু জেনে ফেলেছিল। তাই ওদের নিয়ে গিয়ে শেষই করে দেবে। কর্নেল মিলিটারীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন। থানাতেও। এখন থানাও সতর্ক হয়ে গেছে কারণ খোদ মিলিটারী বিভাগ এই কেস হাতে নিয়েছেন। তারাও বলে,

— আমরা দেখছি স্যার।

— কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে ওদের? কর্নেলও ভাবছেন কথাটা।

এমন সময় ছনু কালুই খবরটা দেন, ওদের গায়ে নাকি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। ব্রজবাবুই বললেন ওদের ফিনিশ করতে।

কর্নেল চমকে ওঠেন সব শুনে — সেকি!

মিঃ রায় বলেন — একটা কিছু করুন স্যার। বাঁচান ছেলেমেয়ে দুটোকে। কুলকিপ্রসাদের কাছে খুন-খারাপি নতুন কিছু নয়। ওদের বাঁচাতেই হবে।

কর্নেল তখনই পুলিশ মিলিটারীকে ফোন করে সঠিক জায়গার খবর দিয়ে নিজেই বের হন তার রাইফেল নিয়ে। ছনু কালুও বাংলোর দু-তিনজন সিকিউরিটিও বন্দুক-ভোজালি-কুড়ুল যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই বের হয়।

ব্রজকিশোরও ভেবে রেখেছে বিজয়-প্রিয়াকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে সহজেই দাদার কোন ওয়ারিশন না থাকার জন্য আইনত ব্রজকিশোরই হবে প্রিয়ার সব কিছুর মালিক। বিজয়ের চিহ্নও থাকবে না। ব্রজ কলকাতাতে গিয়ে প্রমাণ করবে সে কলকাতাতেই ছিল। সহজেই সব কাজ হয়ে যাবে।

কুলকির লোকজন বিজয় প্রিয়াকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধেছে আর ওদের কোমরেই বেল্ট দিয়ে টাইম বোমটা লাগিয়ে দিয়েছে। ওটা নির্ধারিত সময়ে ফাটলেই ওদের দুজনের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। চেনারও কোন উপায় থাকবে না। কেউ সনাক্ত করতে পারবে না কাদের মারা হয়েছে। বিজয়-প্রিয়াকে ওরা শেষই করবে। ওদিকে কুলকিপ্রসাদও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মালপত্র সরিয়ে দিতে চায় ব্রজের সঙ্গে ট্রাকে। যাতে পুলিশ এখানে এলেও কিছু না পায়। তাই বলে সে,

—জলদি কাম খতম কর। দশমিনিট কা আন্দার খতম কর ওদের।

সেইমতো টাইমবোমে সময় নির্দ্ধারিত করে দিয়েছে। প্রিয়ার চোখে জল। সে দেখেছে ওই ব্রজকিশোর মানুষ নয়। একটা নিষ্ঠুর দানব। বিজয়ও বাঁচার জন্য শেষ অবধি লড়াই করে হার মেনেছে। এখন শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা।

স্তব্ধতা নেমেছে রাতের অরণ্যভূমিতে। ওই ঘড়ির শব্দটা যেন মৃত্যুর পদধ্বনির মতই শোনায়। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুও যেন ওদের কাছে এগিয়ে আসছে। একটানা ঝি-ঝির ডাকে বনভূমি ভরে উঠেছে। ওই আদিম আরণ্যক পরিবেশে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পল গুনছে বিজয়-প্রিয়া।

ওদিকে কুলকিপ্রসাদের গুদাম থেকে মালপত্র তুলে ট্রাকে চাপানো হয়েছে। ব্রজও ঘড়ি দেখছে।

ঘন বনের মধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে কয়েকটা মিলিটারী জিপ এসে থেমেছে। দূরে চা বাগানের গাছের বুক ভেদ করে দেখা যায় সেই গুদামটা। কয়েকটা গাড়ি-ট্রাকও রয়েছে।

অন্ধকারে এবার বুকভোর চা গাছের মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে এগোচ্ছে কর্নেল আর একজন ক্যাপ্টেন তার বাহিনী নিয়ে। ওরা ঘিরে ফেলেছে কুলকির গুদাম। ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

ব্রজ বলে — কুলকি, দশমিনিটের কত দেরী?

কুলকি বলে — টাইম বোমে দশ মিনিটই সময় দেওয়া আছে। তারপরই তোমার বিজয়-প্রিয়া দুটো ফিনিশ। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

কর্নেলও ঝোপের আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছে ওদের কথা। দেখা যায় ওদিকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বিজয়-প্রিয়া। কর্নেল সমরজিৎ বুঝেছে, ওদের দুজনকে এরা শেষ করে দেবে বোমার বিস্ফোরণে। আর সেই টাইম বোম ওরা বেঁধে দিয়েছে বিজয়ের গায়ে তাকে বন্দী করে।

যা করার এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই করতে হবে। কর্নেল এগিয়ে যায় বুকে হেঁটে ওদিকে গাছে বাধা বিজয়-প্রিয়ার দিকে। বিজয় হঠাৎ কাছেই ঝোপের মধ্যে খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে চাইল। দেখে গুড়ি মেরে আসছেন কর্নেল। পিছনে আর একজন। বিজয় চমকে ওঠে। কর্নেল ওকে ইশারায় থামতে বলে আর একটা ঝোপের কাছে আসেন। তিনি দেখছেন ওদের কোমরে বাঁধা টাইম বোমটাকে। নীল একটা বালব্‌ জ্বলছে। টিক টিক করে সেকেন্ডের শব্দ উঠছে। তার সঙ্গে ছিল বোম স্কোয়াডের একজন লোক। সে জানে ওই বোম ডিফিউজ করার কৌশল। ওই তার দুটোকে খুলে ফেলতে পারলেই ওই বোম আর ফাটবে না। নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

চা গাছগুলো এখানে বেশ কিছুটা বড় বড়। দূর থেকে বিজয় প্রিয়ার বুক অবধি দেখা যায়। বোম স্কোয়াডের স্টেন্যাচ ঝোপের মধ্যে দিয়ে এসে ওই অবস্থাতেই গুড়ি মেরে বসে ওই টাইম বোমটাকে ডিফিউজ করার চেষ্টা করছে। মাত্র কয়েক মিনিট সময়। এর মধ্যে ডিফিউজ করতে না পারলে

বিজয়-প্রিয়াই নয় কর্নেল সমরজিৎ আর সেই অফিসারও শেষ হয়ে যাবে। চাপা স্বরে কর্নেল বলে — জলদি করো।

অফিসার বলে — হো গিয়া স্যার।

বোমটাই এবার বিজয়ের কোমর থেকে খুলে নিয়ে সেনা অফিসার চলে যায় ঝোপের ওদিকে।

ওদিকে ব্রজ-কুলকি এবার নিরাপদ দূরত্বে সরে যায় গাড়ীর কাছে। আর মাত্র দুমিনিট, একশো কুড়ি সেকেন্ড। তারপরই ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। উড়ে যাবে বিজয়-প্রিয়া। সেই দৃশ্যটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বিজয়ীর মত কলকাতায় ফিরবে ব্রজকিশোর। ওই সাম্রাজ্যের মালিক হবে সে। ভোম্বল পড়ে আছে এখানের কোন অখ্যাত হাসপাতালে পায়ে গুলি লেগে।

ভোম্বল মরুক - বাঁচুক তাতে ব্রজের কিছু আসে যায় না। ওদের নজর বিজয় প্রিয়ার দিকে।

হঠাৎ পিছনে ট্রাক-গাড়িগুলোর ওদিক থেকে কাদের চীৎকার আর শূন্যে গুলির শব্দে সচকিত হয়ে চাইল ব্রজ-কুলকি। হঠাৎ কয়েকটা মিলিটারী এমার্জেন্সী আলোয় ওই বনভূমি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় ঝোপের মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে বেশ কিছু মিলিটারী। তাদের হাতে এস-এল রাইফেল। নলগুলো ওদের দিকে তাক করা। আর কুলকি-ব্রজকে কভার করে আসছে স্বয়ং কর্নেল সমরজিৎ আরও কজন সৈন্য। তাদের ট্রাকও ঘিরে ফেলেছে তারা।

ব্রজকিশোর সামনে কর্নেলকে দেখে চমকে ওঠে। কর্নেল বলেন— ব্রজবাবু কুলকিপ্রসাদজী এতদিন ধরে দুজনে মিলে বহু নিরীহ মানুষের সর্বস্ব লুট করেছেন। খুন করেছেন অনেককে। এবার সারা দেশের মানুষ, সারা দেশকে টাকার জন্য বিদেশীদের কাছে বিকিয়ে দিতে চান। ব্রজকিশোর অবাক হয়। বিজয়-প্রিয়ার কিছুই হয়নি। কোন বোমাই ফাটেনি। ব্রজ বলে,

— এসব মিথ্যা।

কি সত্যি কি মিথ্যা তা এবার প্রকাশ পাবে। পুলিশ সুপারও এরই মধ্যে মিলিটারী হেডকোয়ার্টার থেকে খবর পেয়ে এসে পড়েন। ওদের ট্রাক থেকে বের হয় বিদেশী অস্ত্রের বেশ কিছু পেটি, বিস্ফোরক প্যাকেট।

সকাল হয় চা বাগানে। আজকের সকাল বিজয় প্রিয়ার জীবনে এনেছে

নতুন দিন। কর্নেলও এতদিন পর ব্রজকিশোরকে তার সেই বঞ্চনার উচিত জবাব দিতে পেরেছেন।

ব্রজ-কুলকি তখন পুলিশের হাতে। ব্রজবাবু সর্বকিছু স্বীকার করেন। এবার কর্নেল একটা দলিল দেখিয়ে বলেন,

— এটা আপনি নিজের ঘরে এনে রেখেছিলেন। মনে পড়ে, সেই এটাচির মধ্যে।

ব্রজকিশোর ভাবতে পারেন না এই দলিল কর্নেলের কাছে গেল কি করে। তাহলে এসব চুরি হয়নি, কেউ সরিয়েছে।

কর্নেল বলেন — ওই কারখানা-ব্যবসা ওটা আপনার দাদার নয়। এর সমান অংশীদার নরনারায়ণবাবু। নন্দকিশোরবাবুর বাল্যবন্ধু, ওই বিজয়ের বাবা। তাই এখন ওসবের মালিক আপনি নন, মালিক এই প্রিয়া আর বিজয়।

— না ব্রজ ওই সাম্রাজ্য হারতে চায় না। বলে — আমি বাধা দেব।

হাসেন কর্নেল — আপনি এখন ওই সম্পত্তি পাবার জন্য বিজয়-প্রিয়াকে খুন করার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, দেশদ্রোহী। দেশের শত্রু। বিদেশীর গুপ্তচর আপনি। ব্রজবাবু, এতদিন ধরে যে পাপ আপনি করেছেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জেলে বসে।

সব রাতেরই শেষ হয়। আবার সূর্য ওঠে। তেমনি সব পাপেরই শেষ হয়। আর এই পৃথিবীতেই মানুষ তার পাপের প্রায়শ্চিত্তও করে যায়। তাই ব্রজকিশোর-কুলকিপ্রসাদরা এত করেও পার পায় না।

এবার ফিরছেন কর্নেল, বিজয়-প্রিয়াদের নিয়ে বিজয়ীর মত। তাদের জীবনের সব দুর্যোগ কেটে গেছে। আজ এই সবুজ হলুদ পাতায় ছাওয়া বাগান-এই নীলপর্বত - সাদা মেঘের দেশ ছেড়ে কলকাতায় ফিরতে তাদের মন কেমন করে। এই দেশ তাদের দিয়েছে জীবনের পথ নির্দেশ, স্বপ্নের সত্যতা, বাঁচার আনন্দ।

কর্নেল বলেন -- দেরী করো না বিজয়-প্রিয়া। তৈরী হয়ে নাও। এতটা পথ যেতে হবে। সন্ধ্যায় ট্রেন।

ওদের আবার ফিরতে হবে কলকাতার জীবনে। কর্নেলও খুশী। জীবনের লড়াই-এ তিনি হার মানেননি আজও। আজও তিনি জয়ী হয়েছেন।